প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮
ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রকাশক ঃ
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণে ঃ
বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা

ভূমিকা

সেংঘরের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ বার্লিনে। আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম প্রতিষ্ঠানের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বার্লিনে একটি নিখিল বিশ্ব বুদ্ধিজীবী সম্মেলন আহ্বান করেছিলো ১৯৫৮ সালে। আলোচনার বিষয় ছিলো মানবচিত্তকে সকল কলুষতার মধ্যে কি করে সজীব, যুক্তিবাদী এবং মুক্ত রাখা যায়। প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে মানব মনকে সর্বমুহূর্তে আনন্দ এবং সুস্থতার মধ্যে কি করে প্রত্যক্ষ করা যায়, সে সম্পর্কে বিবেচনা করাও সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিলো। কংগ্রেস হলে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করলেন সেংঘর। সেংঘরের অপূর্ব বাণীভঙ্গি এবং সুর-ঝংকার আজও আমার কানে প্রতিধ্বনি তোলে। ফরাসী ভাষার নিজস্ব একটি সুরসমৃদ্ধি আছে। তার মধ্যে কবি সেংঘর প্রচুর উপভোগ্য অনুপ্রাস এবং ললিত বিশেষণ সংক্রামিত করে যে দ্যোতনা সৃষ্টি করেছিলেন তা কখনও ভুলবার নয়। প্রতিটি ধ্বনি যেন তাঁর চিত্তের গভীর থেকে উৎসারিত হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো যেন পৃথিবীর সকল অভিসম্পাত থেকে মানুষকে মুক্ত করে তিনি একটি উদার সম্প্রীতির মধ্যে সকলকে আবিষ্কার করছেন এবং একটি আদিম পবিত্রতার নিঃসংকোচ অনাবরণের মধ্যে মানুষকে প্রবাহিত দেখছেন। তাঁর কবিতায় তিনি নিজেকে যেমন প্রকৃতির সজীবতার সঙ্গে ওতপ্রোত দেখেছেন—বসন্তের দিনের শস্যের মতো এবং পানির অন্তরঙ্গে মজ্জমান মৃণালের মতো—তেমনি সকল মানুষকেই তিনি একটি অমল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত দেখতে চান। তিনি তাঁর কবিতায় আলো এবং অন্ধকারের প্রভুর কাছে যে প্রার্থনা জানিয়েছেন, বক্তৃতা শুনে মনে হলো সে প্রার্থনা তাঁর একার জন্য নয়, সকল বিশ্ব-বাসীর জন্য—

"হে আমার আলো এবং
অন্ধকারের প্রভু
বিশ্বজগতের সর্বস্বের প্রভু
আমাকে বিশ্রাম দাও
প্রকৃতির শ্যামল ছায়ায়
এবং স্বপ্নের মর্মর ধ্বনির কম্পনের মধ্যে।"

এ-ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে অসহিষ্ণুতা, অবিচার,

উষরতা এবং বিপুল শূন্যতা থাকা সত্ত্বেও সেংঘর সকল দুর্ভাগ্যের ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছেন কেননা তিনি বিশ্বাস করেন প্রভাতের পাখির কূজনের মধ্য দিয়ে সৌভাগ্য অবশ্য আসবে।

সেংঘর আফ্রিকার চিরন্তন একটি প্রাচীনতায় বিশ্বাস করেন, একটি মৌলিক আদিম শুচিতার উপর নির্ভর করেন এবং জনসাধারণের বিভিন্ন অভিচার, সম্মোহন ও কর্মের অভিব্যক্তিকে স্বাগত জানান। এদিক থেকে তিনি পূর্ণভাবে কৃষ্ণ আফ্রিকার প্রতীক। তাই তাঁর কবিতায় "কৃষ্ণ শোনিতে"র কথা শুনি, কৃষ্ণ রমণীর "সুগন্ধ করতালুর" অভয় পাই। তালবীথির "কৃষ্ণ ঘনিষ্ঠতার" প্রশ্রয় দেখি। বার্লিনে কনফারেন্সের সময় কোনও কোনও অবকাশ মুহূর্তে সেংঘরকে নিকটে পেয়েছিলাম। তখন তিনি সংলাপসূত্রে বহু বিষয় সম্পর্কে কথা বলেছেন, প্রধানতঃ তাঁর নিজের দেশ, দেশের মানুষ এবং দেশ ও মানুষের ইতিহাস নিয়ে। তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতায় বিমুগ্ধ হয়েছি কিন্তু প্রধানতঃ বিস্মিত হয়ে ভেবেছি সৃষ্টির প্রতি মমতার অনিবার্যতা না থাকলে জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে সেংঘরের এহেন কুশল-জ্ঞাপন কখনও সম্ভবপর হতো না।

সেংঘরকে আরও কয়েকবার দেখেছি এবং সর্বশেষ সাক্ষাৎকার বাংলাদেশে। বঙ্গভবনে যখন তিনি এলেন, পুরোনো সাক্ষাৎকারের সূত্র ধরে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর এবং অন্তরঙ্গ বিনয় সম্ভাষণ আগের মতোই আছে। তিনি আমাদের দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় জানতে চাইলেন, তাঁর নিজের দেশের কথাও বললেন প্রচুর। তাঁকে দেখে নতুন করে আবার কৃষ্ণ আফ্রিকার প্রাণশক্তিকে দেখলাম।

বর্তমান সংকলন গ্রন্থটি সেংঘরের প্রতি আমাদের অর্ঘ্যস্বরূপ। আমি এর ভূমিকায় আমার শ্রদ্ধানিবেদন যুক্ত করতে পেরে কৃতার্থ বোধ করছি।

ঢাকা

সৈয়দ আলী আহসান

প্রসঙ্গ-কথা

লিওপোল্ড সেঙ্ঘর বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রপতি ও জননেতা, রক্ত-মজ্জায় আফ্রিকান ও বিশ্বনাগরিক, সংস্কৃতি-তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও মননশীল বুদ্ধিজীবী এবং সবার উপরে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। আধুনিক আফ্রিকার কবিকুলের নেতৃপুরুষ হিসাবে তিনি বিশ্বনন্দিত।

এই খ্যাতিমান কবির কবিতার অনুবাদ বাংলা ভাষায় কবিরা ইতোপূর্বে করেছেন। তবে সে সব কাজ ছিলো অনেকটা বিচ্ছিন্ন। প্রায় একযুগ আগে সাবেক পূর্ব বাংলায় যখন জাতীয়তাবাদী চেতনা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে একটা বিস্ফোরণের রূপ নিতে শুরু করে তখনই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে আফ্রো-এশীয় কবিতার একটি পরিকল্পিত সংকলন ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। ওই সংকলনে আফ্রিকার অন্য কয়েকজন কবির রচনার সঙ্গে সেঙ্ঘরের একগুচ্ছ কবিতাও অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্যের প্রতি কিছুটা সচেতনা ও ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা প্রসঙ্গে আফ্রিকার সঙ্গে বাংলাদেশের সাযুজ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠায় আফ্রিকার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে জানবার একটা কৌতূহল উজ্জীবিত হয়ে উঠে। এই কৌতূহলকে সজীব ও উদ্দীপ্ত করে দীর্ঘমাত্রা দানের জন্য কোন কোন সংগঠন ও পত্র-পত্রিকা কিছুটা উদ্যোগও গ্রহণ করে। এই সুবাদেই কাব্রাল ও সেঙ্ঘর প্রমুখ সংস্কৃতি-তাত্ত্বিকদের চিন্তা-ভাবনা ও মৌলিক রচনা আমাদের সামনে আসে। বর্তমান সংকলনের মূল উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসরে সেঙ্ঘরের কবি-প্রতিভার মূল প্রবণতা, তাঁর জীবন ও মতাদর্শকে বাংলাদেশের পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা। বলা বাহুল্য, কবির প্রতিনিধিত্বশীল প্রধান প্রধান সব কবিতা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি—তবু সংকলিত কবিতাগুচ্ছ কবিকে বুঝতে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

এই সংকলনের কবিতাবলী ও সেঙ্ঘরের বহুমুখী চিন্তা-ভাবনার পরিচয় জ্ঞাপক প্রবন্ধদ্বয় পাঠকদের সাধারণভাবে আফ্রিকার সাহিত্য এবং বিশেষভাবে সেঙঘরের সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহিত করে তুললেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে মনে করবো।

দেশের খ্যাতনামা প্রবীণ কবি, রাষ্ট্রপতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা প্রফেসর সৈয়দ আলী আহ্‌সান এ সংকলনের ভূমিকা লিখে দেওয়ায় এর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ সংকলন প্রস্তুত করার ব্যাপারে কবি-বন্ধু আসাদ চৌধুরী, জাহিদুল হক ও সুরাইয়া খানম নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন।

সম্পাদক

সূচীপত্র

লিওপোল্ড সেঙ্ঘর, তাঁর কবিতা

কবীর চৌধুরী

জন্ম সেনিগালের ছোট্ট সেরেরে গ্রাম জোল-এ, ১৯০৬ সালের ৯ই অক্টোবর। শৈশবের মাত্র অল্প কয়েকটি বছর এই গ্রামে কাটিয়েছিলেন তিনি কিন্তু এর আনন্দময় স্মৃতি তাঁর জীবনে কখনো ম্লান হয়নি। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মনের আনন্দে তিনি নদীতে সাঁতার কেটেছেন, নারকেল বাগানের মাঝ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছেন, সমুদ্র তীরে বালুর ওপর অবাধে ছুটোছুটি করেছেন, সকাল-সাঁঝে অজস্র গ্রামীণ লোকগাথা শুনেছেন। আর পরম কৌতূহল ও মমতা নিয়ে দেখেছেন গাছপালা, পশুপাখী, আকাশের নক্ষত্ররাজি। এর পরিচয় তাঁর পরবর্তী কালের কবিজীবনের অনবদ্য ফসলের মধ্যে সুবিধৃত। শৈশবের এই স্মৃতির কাছে সেঙ্ঘর বারবার ফিরে গেছেন, আনন্দমুখর এই শিশু-রাজ্যের অন্বেষা তাঁর কাব্যের অন্যতম মূল স্বর। এই ভুবন অনেক সময়ই আদর্শায়িত রোমান্টিক কল্পনাজাত, কিন্তু কাব্যিক সত্যে উদ্ভাসিত। এই ভুবনে কল্পনা আর বাস্তবের মাঝখানে যে সীমারেখা তা প্রায়ই ধূসর, দুর্নীরিক্ষ্য। গ্রামের শিশু যুবা বৃদ্ধ এই জগতে যখন ছায়াঘেরা কোন জলাশয়ে বা স্রোত-ধারায় অবগাহন করে তখন তাদের পাশাপাশি দেহ প্রক্ষালন করে তাদের লোকান্তরিত পূর্বপুরুষেরা, আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কুমীর-পেচক-গরু-মৎস্য কন্যার দল বিচিত্র ধ্বনি তরঙ্গে গোধূলির আবহকে অভূতপূর্ব ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে তোলে। সেঙ্ঘরের অনেক কবিতায় এই ছবি ধরা পড়ে। তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ Chants d' Ombre (১৯৪৫-এ প্রকাশিত, যদিও এই গ্রন্থভুক্ত অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছে তাঁর যৌবনে, প্যারিসের প্রবাস জীবনে, ১৯৩০-এর দশকে) থেকে শুরু করে Nocturnes-এর (১৯৬১-তে প্রকাশিত) অনেক কবিতায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। এই জাতীয় কোন কোন কবিতা পড়তে আমার কখনো কখনো উইলিয়াম ব্লেকের কথা মনে হয়েছে, কখনো কখনো মনে হয়েছে জীবনানন্দ দাশের কথা, তবে সেঙ্ঘরের

কবিতার সঙ্গে এঁদের কবিতার ভাবমণ্ডল ও সুরের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যদিও এক স্তরে সাদৃশ্যও চোখে পড়বে অনেক পাঠকের।

লিওপোল্ড সেঙ্ঘর চেয়েছিলেন, অল্প বয়স থেকেই, পাদ্রী হ'তে, নয়তো শিক্ষক হ'তে। ছোট্ট গাঁ জোল থেকে তিনি গেলেন চার মাইল দূরের ন্‌গাসোবিলের ফরাসী ধর্মযাজকবৃন্দ পরিচালিত বোর্ডিং-স্কুলে। ফরাসী ব্যাকরণ, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ল্যাটিন ও ধর্ম-গ্রন্থাদি পড়লেন আট বছর। তারপর গেলেন ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার রাজধানী শহর ডাকারের লিবারম্যান জুনিয়ার সেমিনারিতে। এই বিরাট শহরের মানবিক উষ্ণতা রহিত উদাসীন পরিবেশ তাঁর ভালো লাগলো না। সেখানে চার বছর কাটাবার পর ১৯২৬ সালে যখন সেঙঘরকে জানানো হল যে ধর্ম-পেশা তাঁর জন্য নয়, তখন প্রথমটায় তিনি ভয়ানক আশাহত হলেও পরে সামলে নিয়ে শিক্ষক হবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবার তিনি ডাকারেরই মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হলেন। ল্যাটিন ও গ্রীক ক্লাসিকের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল। এখন সাফল্যের সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করে, আংশিক সরকারী বৃত্তি নিয়ে প্যারিসের পথে পাড়ি দিলেন ১৯২৮-এ।

প্যারিসের প্রবাস-জীবন সেঙ্ঘরের কাব্যপ্রতিভা বিকাশের পথে সম্ভবতঃ চূড়ান্ত একটি ভূমিকা পালন করেছে। সেনিগালে থেকে গেলে কোনদিন তিনি কবিতা লেখার প্রেরণা অনুভব করতেন কি না তা জোর দিয়ে বলা যায় না। স্বদেশ থেকে দূরে ভিন্ন পরিবেশে বসে আফ্রিকা, তার প্রকৃতি, তার মানুষ, সেই মানুষের স্বপ্ন সাধ আশা আকাঙ্ক্ষা, বিশেষ করে তাঁর নিজের একান্ত পরিচিত স্নিগ্ধ কোমল গ্রামীণ আবহ তাঁর মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করলো, সেই অনুভূতিকে কবিতায় আকারে রূপায়িত করতে প্রণোদিত করলো তাঁকে। অবশ্য এই ব্যক্তিগত পটভূমির সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক-ঐতিহাসি . ঘটনার তাৎপর্যও কম নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই কালো মানুষের নব জাগরণের যুগ শুরু হয়ে যায়। এই জাগরণের ঢেউ ওঠে আমেরিকায়. ইউরোপে, আফ্রিকায়, এশিয়ায়। কালো মানুষেরও যে একটা বিশাল গৌরবোজ্জ্বল অতীত রয়েছে, তার ঐতিহ্যবাহী বিচিত্র সমৃদ্ধ শিল্পকর্ম, তার লোকগাথা, পুরাকাহিনী, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলার সম্ভার নিয়ে সাদা মানুষের সামনে যে সে নির্দ্বিধায় মাথা উঁচু

করে দাঁড়াতে পারে, সে যে নিতান্ত অন্যায়ভাবে শোষণ-অবহেলা-ঘৃণার শিকার হচ্ছে এই চেতনার প্রসার ঘটতে থাকে বিশ্বের বিভিন্ন খণ্ডে। সেঙ্ঘর এই কৃষ্ণ রেনেসাঁর প্রথম দীপ্ত সার্থক ফসল। এবং এই রেনেসাঁকে নতুন ব্যাপ্তি ও মানসিকতাও দান করেছেন তিনি, একে সামনের দিকে নিয়ে গেছেন তাঁর কবিতাবলী দিয়ে, তাঁর নিগ্রো-নন্দনতাত্ত্বিক দর্শন দিয়ে, তাঁর প্রগতিশীল মানবতাবাদী সমন্বয়-প্রয়াসী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে। বিশেষ করে তিনি নিগ্রো শিল্পকলার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর অনেক লেখায় ও বক্তৃতায়। তিনি দুঃখ করে বলেছেন যে এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদেও বিদেশীরা আফ্রিকাকে জানে শুধু তার বনানী প্রান্তর পর্বতমালার মধ্য দিয়ে, তার জীবজন্তু আর বিশালাকৃতি কিছু স্মৃতিসৌধের মধ্য দিয়ে, এবং এই জানা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, বহুলাংশে ভ্রান্তও। এর অন্তরসত্তাকে জানতে হলে তাদের যেতে হবে এর সৃজনশীল মহিমাময় বিচিত্র শিল্পকর্মের কাছে। তাঁর ভাষায় "To begin with, one must go directly to the Man : I mean what most profoundly reveals man with authenticity : his art," (সেঙ্ঘরের Afrique de l' Quest, berceau de l'art nigre-এর ভূমিকাবলী দ্রষ্টব্য)।

কৃষ্ণ নবজাগরণের ঢেউ এবং ব্যক্তিগত প্রবাসজীবন উভয়ই যে সেঙ্ঘরের কবিমনকে প্রথম বিকশিত করে তুলেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সুদূর প্যারিসে বসে ১৯৩০-এর দশকে তাঁর কালো দেশ তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। তার কথা লিখলেন তিনি, এবং তারপর থেকে কৃষ্ণ সভ্যতার জয়গানই তাঁর সমগ্র সত্তার অন্যতম বিশ্বাস ও কর্ম হয়ে ওঠে। এতদিন শুভ্রতাই প্রতীক হয়েছে সৌন্দর্যের, আলোর, দীপ্তির, সচিত্রতার, আনন্দের, জীবনের। সেঙ্ঘরের কাব্যে কালো রং-কে, অন্ধকারকে, রাত্রিকে আমরা ব্যবহৃত হতে দেখি ভিন্ন অর্থে, ভিন্ন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। এই কালো দ্যুতিময়, জীবনের প্রাণ ঐশ্বর্যে, ভাস্বর, অনিন্দ্য সুন্দর। এ কালো আর দুঃখ, হতাশা, মৃত্যুর প্রতীক নয়। অবশ্য সেঙ্ঘরই যে শব্দ ব্যবহার এবং প্রতীকের ক্ষেত্রে এই নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন তা নয়। ডানবার, দ্যুবয়, ক্লড, ম্যাকে, কাউন্টি কালেন, ল্যাংস্টন হিউজেস-এর লেখায় ইতোমধ্যে এই ধারা সূচিত হয়েছে। সেঙ্ঘর নিজস্ব ভঙ্গীতে একে আরো সম্প্রসারিত করলেন।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা, বস্তুতঃ পক্ষে সমগ্র সেঙ্ঘর-কাব্য সম্ভারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা, Femine noire", কৃষ্ণ নারী-তে এই কালোর জয়গান অপূর্ব গীতিময়তায় উচ্চারিত হয়েছে :

নগ্ন নারী, কৃষ্ণ নারী
তোমার যে রঙে তুমি বসনাবৃতা তাই জীবন
তোমার যে আকারে তুমি সুসজ্জিতা তাই সৌন্দর্য।
তোমার ছায়ায় আমি বেড়ে উঠেছি,
তোমার হাতের স্নিগ্ধ কোমল ছোঁয়া পড়েছে
আমার চোখের পাতায়........

নগ্ন নারী, কৃষ্ণ নারী
দৃঢ় ঋজু দেহ সুপক্ক ফল,
কালো মদের তীব্র আনন্দ বন্যা,
আমার মুখকে গীতিময় করে তোলে
তোমার মুখ।

সে-যুগের আফ্রিকার রাজনৈতিক পরিবেশে, ১৯৩৬-এর দিকে, এই কবিতার বৈপ্লবিক গুরুত্ব ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। লক্ষণীয় যে সেঙ্ঘর কোন একজন বিশেষ কৃষ্ণাঙ্গ রমণীকে লক্ষ্য করে এ কবিতা রচনা করেন নি, কালো মেয়ে এখানে জেনেরিক অর্থে ব্যবহৃত। আঙ্গিক ও বক্তব্য উভয় দিক থেকেই সেঙ্ঘর কবিতাটিতে একটা নতুন বিদগ্ধ দ্যোতনা সংযোজন করেছেন। কবিতাটির কোন কোন অংশে ইউরোপীয় পরাবাস্তববাদী কবি-কুলের প্রভাব সুস্পষ্ট, তাঁদের মতোই স্তোত্র আবৃত্তির ভঙ্গীও লক্ষণীয়। কবিতাটি স্পষ্টতঃই বহুমাত্রিক। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এর অজস্র আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে! কেউ কেউ এর মধ্যে বর্ণবাদী সুর শুনেছেন। হয়তো, আছে সেই সুর। কিন্তু এ বর্ণবাদ হিংসাত্মক নয়, পরশ্রীকাতরতামণ্ডিত নয়, শোষণলিপ্সু নয়, আধিপত্য বিস্তারাকাঙ্ক্ষী নয়। এর উৎস আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনের কামনায়, হীনমন্যতা বোধ থেকে উত্তরণের ইচ্ছায়, সঙ্গত গর্ব ও গৌরবের জয় ঘোষণার তাগিদে, অপার ভালোবাসায়। ১৯৪৮ সালে জাঁ-পল-সার্তর একেই বলেছেন "এ্যান্টি-বেসিস্ট রেসিজম"। সেঙ্ঘর সম্পাদিত

Anthologie de la nouvelle poesie negre et malgache-র বিখ্যাত ভূমিকায় সার্তর এই মনোভঙ্গীকে বিশ্লেষণ করে লিখেছিলেন :

"কালো মানুষকে দেখ, উন্নত ঋজু, আমাদের সাদা মানুষদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ওই দৃষ্টি আমাদের চিরে চিরে দেখে, আমি অনুভব করেছি তা, আর ওইভাবে অনুভব করার জন্যই তোমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। হাজার বছর ধরে সাদা মানুষ শুধু দু'চোখ মেলে দেখবার সৌভাগ্য ভোগ করে এসেছে, তাদের পানে কেউ এভাবে তাকিয়ে দেখেনি......আজ এক কালো কবি, সাদা মানুষের চিত্তে কি অনুভূতি জাগে না জাগে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ভাবিত না হয়ে, তার প্রিয়ার কানে কানে গুঞ্জন করে বলছে :

'নগ্ন নারী, কৃষ্ণ নারী
তোমার যে রঙে তুমি বসনাবৃতা তাই জীবন......

নগ্ন নারী, কৃষ্ণ নারী
দৃঢ় ঋজু দেহ সুপক্ক ফল,
কালো মদের তীব্র আনন্দ বন্যা......',

আর আমাদের শুভ্রত্ব তখন মনে হয় মৃত্যু-পাণ্ডুর, বিবর্ণ, অদ্ভুত একটা রঙ, আমাদের ত্বককে যা শ্বাস গ্রহণ করতে দেয় না, আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো কাপড়ের পুঞ্জের মতো, কনুই আর হাঁটুর কাছে এলোমেলো, যাকে ঝেড়ে সরিয়ে দিতে পারলেই প্রকৃত মানুষের মাংস বেরিয়ে পড়বে, যে মাংসের রঙ কালো মদের মতো।"

সেঙ্ঘরের প্রথম কাব্যগ্রন্থের আরেকটি অনবদ্য কবিতা "জোল"। স্মৃতিচারণমূলক এই কবিতা। গভীর আবেগ, অজস্র দৃশ্যের গীতিমুখর বর্ণনা, সুরেলা চিত্রকল্প—সব মিলিয়ে এই কবিতাটিও নানা স্তরে উপভোগ্য।

Chants d' Ombre গ্রন্থের প্রথম কবিতাটিতেই স্মৃতিচারণের সুর অবারিতভাবে উচ্চারিত। প্যারিসে কবির মন নিঃসঙ্গ, একাকী, বিচ্ছিন্নতার বেদনায় ভারাক্রান্ত, চারিদিকে যে-মুখ তিনি দেখেন তা পাথরের মতো কঠিন, অনুভূতি বর্জিত, চাতুর্যভরা। তাই শান্তি ও সান্ত্বনার অন্বেষায় তিনি স্বদেশের স্মৃতিকে লালন করেন, মনে মনে ঘুরে বেড়ান গাম্বিয়া আর সালুম

নদীর তীরে। বিশ বছর পরে সেঙ্ঘর যখন আবার প্যারিসে ফিরে যান তখন কিন্তু প্যারিসেব স্মৃতি তাঁর কাছে নিরানন্দ মনে হয়নি, কারণ ইতোমধ্যে তাঁর স্বদেশ-অন্বেষা একটা সার্থক কেন্দ্র বিন্দুতে পৌঁছেছে, এলিয়েনেশন-জনিত প্রেক্ষিতের ফলে যে বিকৃতি ঘটেছিল তা ততদিনে অপসৃত।

সেঙ্ঘরের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ Hosties noires-এর প্রকাশ কাল ১৯৪৮ হলেও এর অধিকাংশ কবিতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন রচিত। শ্বেতাঙ্গদের এই যুদ্ধে ফ্রান্সেব ঔপনিবেশিক নাগরিক সেঙ্ঘর নিজেও সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন, দেখেছিলেন সহযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও কালো মানুষের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গরা কি বকম বর্ণবাদী পৃথকাচারণ কবতো। এই যুদ্ধে বহু কালো মানুষ, তাঁর স্বদেশবাসী সুজন স্বজন, প্রাণ দিয়েছে। তাদের তিরোধানের স্মৃতিকে সেঙ্ঘর এই গ্রন্থের একাধিক কবিতায় উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের এই আত্মদান, শ্বেতাঙ্গদের সংগ্রামে কৃষ্ণাঙ্গদের আত্মাহুতি, শুধু ফ্রান্সের কল্যাণের জন্যই নয়, বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্যও বটে, তাই গভীর আবেগের সঙ্গে তিনি উচচারণ করেন:

তোমরা, সেনিগালের যোদ্ধারা, কালো ভাইরা আমার,
বরফ আর মৃত্যুর আড়ালে উষ্ণ তোমাদের হাত।
তোমাদের অস্ত্র-ভ্রাতা রক্ত ভ্রাতা আমি ছাড়া
কে তোমাদের গান গাইবে?
মন্ত্রীদের কাছে আমি বক্তৃতার ভার ছেড়ে দেবো না,
সেনাধ্যক্ষদের কাছেও নয়।
তাচ্ছিল্য ভরা সামান্য প্রশংসা বাণীর সঙ্গে
তোমাদের আমি পরম অবহেলায় সমাহিত হতে
দেব না, দেব না।
তোমরা কপর্দকহীন নও, মর্যাদাহীন নও,
ফ্রান্সের প্রতিটি প্রাচীর থেকে
আমি বানানিয়া হাসি টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবো।

এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে সেঙ্ঘরের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার প্রখর উন্মেষের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। শোষণের বিরুদ্ধে, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে

কবি এখানে সোচ্চার, বিশেষ করে আফ্রিকার কালো মানুষের লাঞ্ছনার প্রতিবাদে তাঁর কণ্ঠে কখনো কখনো সুস্পষ্ট ক্রোধের তীব্রতা লক্ষণীয়:

হে প্রভু, যারা আফ্রিয়াকে মাকিসার্ডে পরিণত করছে,
আমার যুবরাজদের বানিয়েছে সার্জেন্ট মেজর,
গৃহভৃত্যদের করেছে 'বয়'..........
তাদের ক্ষমা করো তুমি।
কারণ যারা আমার এক কোটি সন্তানকে
তাদের জাহাজের কুষ্ঠ-কুষ্ঠরীতে পুরে
বাইরে চালান দিয়েছে,
হত্যা করেছে বিশ কোটিকে,
তাদেরকেও তোমার ভুলে যেতে হবে।

কিন্তু এই ক্রোধ ও ঘৃণার উৎসরণকে কবি নিয়ন্ত্রিত করেছেন তাঁর কাব্যে। সেখানে শোষণবিরোধী সুরেব সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রার্থনার সুর, আশা বিশ্বাস এবং শান্তির কামনা। কবির আকাঙ্ক্ষিত বিশ্বে যুদ্ধের স্থান থাকবে না, ঘৃণাহীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়বে সব মানুষ, সাদা-কালো-বাদামী, রামধনু রঙের মতো।

সেঙ্ঘরের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ Ethiopiques প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। এই গ্রন্থের কবিতাবলী বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গী এবং আবেগ-অনুভূতির ব্যাপকতা-বৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্যময়। বিগত কয়েক বছর কবি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রবলভাবে নিয়োজিত ছিলেন, যার অবিসংবাদিত ছাপ পড়েছে এই গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতায়, কিন্তু তাঁর কবিসত্তা যে সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ করেছে তার পরিচয়ও গ্রন্থভুক্ত কবিতাবলীতে নির্ভুলভাবে উপস্থিত। কঙ্গো, লি কায়া-মাগান, এক নিউইয়র্ক, ঢাকা প্রভৃতি কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে নিতান্ত অমনোযোগী পাঠকের চোখেও তা ধরা পড়বে। বিশেষ করে 'কঙ্গো' কবিতাটি আবেগের গভীরতায়, চিত্রকল্পের ঐশ্বর্যে, বহু-বিস্তারী ভাব-ব্যঞ্জনায়, নদীর মধ্যে নারীসত্তা আরোপের শৈল্পিক কুশলতায় অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবীদার। কঙ্গো শুধু নদী নয় এখানে, সব জীবনের উৎস, বিশাল নারী মূর্তি, সকল প্রাণীর জন্মদাত্রী, শুধু মাছ বা পাখপাখালীর নয়, কুমীর, জলহস্তীরও, এবং প্রগাঢ় বাসনার রং-এ রাঙা কবি-প্রিয়াও সেই সঙ্গে সঙ্গে। কৃষ্ণ নারীর যে ছবি কবি ইতিপূর্বে চিত্রিত করেছেন তার সঙ্গে এই কবিতার কোন কোন অংশের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

এই কবিতায় কখনো কখনো কবি নদীর নানা গুণের কথা বলেছেন পরাবাস্তব-বাদী ভঙ্গীতে, অজস্র কাটা কাটা শব্দ সংযোজন করে। চিত্রকল্পের সম্ভার ছাড়াও এই কবিতার অন্যতম ঐশ্বর্য এর ধ্বনি-তরঙ্গ। কবিতাটির মধ্যে উদ্দাম একটা ছন্দ ও সুর, তাল ও লয়ের দ্যোতনা আছে, যা জীবনের ছন্দেরই স্মারক। আবার এ কবিতা যে কোন একটি নদীর জয়গাথা নয়, একান্তভাবে কালো আফ্রিকার বিশেষ একটি নদীর জয়গাথা, এবং কালো মেয়ের সৌন্দর্য কীর্তনের মতো এর ছত্রে ছত্রেও কালো চেতনার প্রোজ্জ্বল উদ্ভাবন। নিউ-ইয়র্কের উপরে লেখা কবিতাটিতেও যে অংশে তিনি নিগ্রো এলাকা হারলেমের কথা বলেছেন সেখানেই জীবনের উষ্ণ অনুভূতি তীব্রভাবে উপস্থিত, অন্যত্র নিষ্প্রাণ প্রেমহীন যান্ত্রিকতা :

আকাশের সব পাখী
অকস্মাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে টেরাসের উঁচু ভস্মের নীচে।
কোন শিশুর কলহাস্য প্রস্ফুটিত হয় না সেখানে......

নাইলনে মোড়া পা। পায়ে, স্তনে
কোন স্বেদ নেই, কোন ঘ্রাণ নেই।
কোন স্নেহবাক্য নেই কারণ মুখ সব ওষ্ঠবিহীন।
নগদ মুদ্রা কিনে নেয় কৃত্রিম হৃদয়......
নদীর জোয়ারে ভেসে যাওয়া শিশু-দেহের মতো
কালো জলে ভেসে যায়
হাইজিনিক ভালোবাসা ॥

সেঙ্ঘরের নিউইয়র্কে স্বপ্ন, কল্পনা, বাস্তব, অতীতের নানা স্মৃতি সব মিশে একাকার হয়ে গেছে। এই কবিতায় উচ্চারিত সব উক্তিই যে আক্ষরিক বাস্তব অর্থে অভ্রান্ত তা নয়, কিন্তু কবি-মনের অনুভূতির সত্য প্রকাশে দীপ্তিমান। এই কবিতার ধ্বনি-ঐশ্বর্যও প্রগাঢ়। অনেক জায়গাতেই চঞ্চল, উদ্দাম, গতিময়। মনে হয় পুরো জাজ্ অর্কেস্ট্রার তালের কথা মানসপটে রেখে তিনি এই কবিতা রচনা করেছেন, শব্দ চয়ন ও ছন্দ নির্মাণ করেছেন। অবশ্য সেঙ্ঘরের অনেক কবিতাতেই বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি লক্ষ্য করবার মতো।

লিওপোল্ড সেঙ্ঘরের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের নাম Nocturnes, প্রকাশ কাল ১৯৬১। এই গ্রন্থে এক দশকেরও পূর্বে প্রথম প্রকাশিত দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতার সঙ্গে অনেক ক'টি নতুন কবিতা পাই আমরা। এই কবিতাগুলি শোকগাথা এবং এই কবিতাগুলিতেই সেঙ্ঘর তাঁর এযাবৎ প্রচারিত নিগ্রো-আফ্রিকান কবিতার মূল কাব্যতত্ত্বের সূত্রগুলি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে আপন শিল্পকর্মে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। এই এলিজিগুলিতে রাত্রিকালীন বেদনার্ত স্বর ধ্বনিত হয়েছে, আলো এবং অন্ধকারের প্রতীকী তাৎপর্য কাব্য-রূপ লাভ করেছে. কখনো কখনো প্রায় সাতরীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে জীবনের সকল প্রজ্ঞা, সকল জাগতিক সাফল্য কবি-রাষ্ট্রপতির চেতনায় অর্থহীন শূন্যতায় প্রতিভাত হয়েছে :

> সকল সম্মাননার ঐশ্বর্য
> এক সাহারার মতো।
> শুধু বিশাল এক শূন্যতা, বীর্যহীন, বৃক্ষহীন, তৃণহীন,
> চোখের পাতা পড়ে না,
> স্পন্দিত হয় না হৃদয়ও।

এই গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা "Elegie de Minuit". চিত্রশিল্পীর মতো কবি এই কবিতায় আলো-আঁধারের রূপ নিয়ে খেলা করেছেন, শব্দ ও বিশেষ দ্যোতনাময় বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তির সাহায্যে জীবনের আপাত উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবহুল অভিজ্ঞতার অন্তরালে যে নিরানন্দ গতানুগতিকতা তাকে তুলে ধরেছেন, নৈরাশ্যের অতলতা থেকে উঠে এসে কবিতার অন্তিম চরণ ক'টিতে শৈশবের শান্তিতে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছেন, জেগে উঠতে চেয়েছেন নতুন পৃথিবীর নতুন এক উষালগ্নে :

> শান্তি আসবে, প্রভাতের দেবদূত আসবে,
> ধ্বনিত হবে অপ্রাকৃত পাখীদের গান,
> ফুটে উঠবে উষার আলো।
> আমি মৃত্যু-নিদ্রায় ঢলে পড়বো,
> সেই নিদ্রা যা বাঁচিয়ে রাখে কবিদের........
> আমি ঘুমিয়ে পড়বো উষালগ্নে

দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আমার গোলাপী পুতুল,
আমার পুতুল, সোনালী সবুজ চোখ,
আর আশ্চর্য ভাষা তার কন্ঠে,
সে-ভাষা একটি কবিতার ভাষা বলে।।

সেঙ্ঘরের কবিতা একটি সীমিত অঙ্গনে প্রধানতঃ তার অন্তর্নিহিত কাব্যগুণের জন্যই সমাদৃত হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। অনেক সময় তাঁর নিগ্রো-কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদ এবং কৃষ্ণ রেনেসাঁর অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে তাঁর ভূমিকাকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বদানের ফলে বৃহত্তর অঙ্গনে তার কবিতার শৈল্পিক মূল্যায়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। একটি স্বাধীন কালো দেশের কর্মচঞ্চল রাষ্ট্রপতি রূপে তাঁর বিভিন্ন ভূমিকাও অনেক সময় তাঁর কাব্যকৃতির নিরপেক্ষ মূল্যায়নের সহায়ক হয়নি। কিন্তু সত্তরের দশকে তাঁর কবিতার যথার্থ মূল্যায়নের দিকে সাধারণ পাঠককুল এবং একাধিক দক্ষ সমালোচক এগিয়ে যাচ্ছেন। আজ একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে লিওপোল্ড সেঙ্ঘর বর্তমান শতাব্দীর বিশ্ব-সাহিত্যের একজন অত্যন্ত শক্তিমান স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত বিশিষ্ট কবি বলে পরিগণিত হবেন।

সেঙ্ঘরের কবিতার আফ্রিকান পটভূমি

আবদুল হাফিজ

রাষ্ট্রপতি সেঙ্ঘর ডাকারের দক্ষিণে পঁচাত্তর মাইল দূরে একটি ছোট্ট গ্রাম জোআলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯০৬ সালে, তাঁর পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী এবং 'সিরার' উপজাতির অন্তর্ভুক্ত, তদুপরি সেঙ্ঘর পরিবার ছিলেন খ্রীস্টান ও ক্যাথলিক, আশ্চর্য বটে যে সিরার উপজাতিটি শুধু ক্ষুদ্র নয়, এ উপজাতিটির চারপাশে বসবাস করে মুসলিম জনগণ এবং মুসলিম জনসংখ্যাই হচ্ছে সেনে-গালের বৃহত্তম জনসংখ্যা। রাষ্ট্রপতি সেঙ্ঘরের পুরো নাম হচ্ছে লিওপোল্ড সিদার সেঙ্ঘর, তাঁর খ্রীস্টান নাম হলো লিওপোল্ড, 'সিরার' উপজাতীয় নাম হলো 'সিদার', আর সেঙ্ঘর নামটি 'ডাক নাম' এবং তা নেয়া হয়েছে পর্তুগীজ ঐতিহ্য থেকে, এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি সেঙ্ঘর মায়ের নামকেও নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, কেননা সিরার উপজাতিটি মাতৃতান্ত্রিক—তাঁর মায়ের নাম নীলানে, সেঙ্ঘর লিখতেন 'সিদার নীলানে'। পর্তুগীজদের সঙ্গে সেঙ্ঘর পরিবারের কোন পূর্বপুরুষের যোগাযোগ ঘটেছিল বলে পর্তুগীজ ঐতিহ্য থেকে পাওয়া 'সেঙ্ঘর' শব্দটিকে তিনি নিজের ধর্মীয় ও উপজাতীয় নামের অঙ্গীভূত করলেন চিরকালের জন্য এবং এখানেই খুঁজতে হবে রাষ্ট্র-পতি সেঙ্ঘরের কবিতার অন্তর্ভুক্ত উদার এবং দরদী মানবিকতার সূত্রসমূহকে, মাতৃতান্ত্রিক 'সিরার' উপজাতির মর্মার্থকে এবং সর্বোপরি পর্তুগীজ রক্তের ধারাকে।

রাষ্ট্রপতি সেঙ্ঘর ব্যক্তিগতভাবে একটি সংখ্যালঘু উপজাতীয় খ্রীস্টান গ্রুপের সদস্য হলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত দেশের তিনি নেতা, দার্শনিক ও কবি, কিন্তু এও বাহ্য, আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মত, সেনেগালী জনগণ প্রধানতঃ উপজাতীয় ঐতিহ্যের অধিকারী, আবাল্য তিনি এই বিচিত্র সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় লালিত, তাঁর মানস-বিশ্ব গঠিত হয়েছে ঔপনিবেশিক

আসলে, আবার তিনিই ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানকে ত্বরান্বিত করার জন্য শ্রম ও প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছিলেন ঐকান্তিক দুঃসাহসে, আর আজ তিনিই সেনেগালের ভাগ্য-নিয়ন্তা ও নতুন সেনেগালের স্থপতি। আফ্রিকার মর্মে মর্মে যে বাণী যুগ-যুগান্ত পেরিয়ে একাল অবধি সম্প্রসারিত হয়েছে, রাষ্ট্রপতি সেঙ্ঘর সে-বাণীর বাহক। আফ্রিকার মানুষ ও পরিবার, ব্যক্তি ও সমষ্টি, উপজাতি ও জাতি, রাষ্ট্র ও রাজনীতি, আফ্রিকান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি—সব বিষয়ে সেঙ্ঘরের নিজস্ব বক্তব্য আছে এবং তাঁর বক্তব্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

আফ্রিকার পরিবার ও পারিবারিক সংগঠন সম্পর্কে তিনি পরিচ্ছন্ন ভাষায় বলেছেন,

The family in Africa is the clan and not as in Europe 'mum', 'dad' and 'baby', It is not the household but the sum of all persons, living and dead, who acknowledge a common ancestor. As we know, the common ancestral lineage continues back to god. Often a certain animal or a tree from the local fauna or flora is identified with the clan.

কবি সেঙ্ঘরের কবিতাবলীর বক্তব্য বুঝতে হলে আফ্রিকার পারিবারিক সংগঠন এবং তার ঐতিহ্যকে অবশ্যই বুঝতে হবে। আফ্রিকার ব্যক্তিমানুষ এবং পরিবার, আমাদের দেশের বা ইউরোপের ব্যক্তি এবং পরিবারের মত নয়, ক্লান বা গোত্রই হচ্ছে সেখানে মৌলিক পারিবারিক ইউনিট এবং প্রতিটি গোত্রই নিজের উৎপত্তির কারণ হিসেবে গণ্য করে গোত্রের পূর্ব-পুরুষকে। গাছ ও জন্তু-জানোয়ারের নামের সঙ্গে গোত্রের অভিন্নতাও সে-সমাজে স্বীকৃত।

রাষ্ট্রপতি সেঙ্ঘর উপনিবেশবাদের শোষণ ও জুলুমকে একজন বুড়োর মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন, 'white men are cannibals. They have no respect for life'. আসলে এ শুধুমাত্র বিশেষ কোনো বুড়োর কথা নয়, এ হলো সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের কৃষ্ণ জনতার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। সেঙ্ঘর বাল্যে এবং যৌবনে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সংকটকে তীব্রতম অনুভূতিতে ধারণ করেছিলেন এবং সঙ্গত কারণেই দেশকে মুক্ত করার কাজে জীবনের সেরা দিনগুলোকে নিয়োজিত করেছিলেন।

নিজের দেশ সেনেগাল, ফরাসী উপনিবেশবাদের অধীনস্থ সব কটি দেশ এবং সমগ্র আফ্রিকা সম্পর্কে তাঁর পড়াশোনা ছিল অঢেল। নিজের দেশের সামাজিক পরিবেশ এবং সামাজিক সংগঠনসমূহ সম্পর্কে তিনি সমাজবিজ্ঞানীর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা নন, তাত্ত্বিকও বটে। আফ্রিকার সমাজ সম্পর্কে সেঙ্ঘর বলেছেন,

আফ্রিকার সমাজ সব সময় মরমিয়া জগতের সঙ্গে জড়িত না হলেও, সব রকমের কারিগরি কর্মকাণ্ড, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, শিল্প ও যাদুবিদ্যাগত কাজকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত। কারিগরি কাজকর্ম বিশেষত উৎপাদনশীল শ্রমে এগুলোর তাৎপর্যময় ভূমিকা রয়েছে। আমরা এমন একটা সমাজের কথা বলছি যে-সমাজ মূলত মানবিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল অথবা ভিন্নভাবে বলা যায়, মানুষ ও ঈশ্বরসমূহের সম্পর্কেব উপর নির্ভরশীল। এ সমাজ সর্বপ্রাণবাদী এবং এ সমাজ জীবন ধারণের ন্যূনতম জিনিস পেলেই খুশী, এ সমাজে পার্থিবের চেয়ে অপার্থিব খাদ্যে বেশি আগ্রহী এবং এ সমাজ প্রাকৃতিক এবং অতিপ্রাকৃতিকের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখে না।

আফ্রিকার জনগণ অতিপ্রাকৃত শক্তিসমূহকে নিজেদের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে, একেবারে মাথায় আছেন 'এক ঈশ্বর', যাকে বলা যায়, 'অ-স্বষ্ট ঈশ্বর,' ঈশ্বরের পর পরই স্থান পায় পূর্ব-পুরুষরা এবং পূর্ব পুরুষদের মধ্যে যিনি প্রথম, তিনি হচ্ছেন উপজাতির প্রতিষ্ঠাতা এবং ঈশ্বর-প্রতিম।

আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ পরিবার ও সমাজ বলতে যা কিছু বোঝে, তার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপ বা আমাদের এই বাংলাদেশের পরিবার বা সমাজের কোন মিল নেই। সম্পত্তি বা প্রোপার্টি সম্পর্কেও আফ্রিকান জনগণের ধারণা একেবারে ভিন্ন, উৎপাদনের সমস্ত হাতিয়ার, জমিজমা, মৃত্তিকা এবং মৃত্তিকার অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা যায় না, তার কারণ আফ্রিকান জনগণ সর্বপ্রাণবাদী বলেই জমিজমা বা মৃত্তিকাকে 'একজন ব্যক্তি' বা 'একজন দেবতা' হিসেবে দেখে। গোত্র-বিশেষের পূর্বপুরুষ, যিনি কোনো বিশেষ ভূখণ্ডকে জঙ্গলমুক্ত করেছিলেন এবং তা দখল করেছিলেন, তিনি সেই ভূ-ভাগের মধ্যে অবস্থিত দেবতার সঙ্গে চুক্তিতে উপনীত হয়েছিলেন এবং সে-চুক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রিয়াদির মাধ্যমে পাকা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু পূর্বপুরুষ, যিনি জমি দখল করেছিলেন,

তিনি কখনো নিজের নামে জমি গ্রহণ করেননি, তিনি তাঁর গোত্রের পক্ষ থেকে এবং গোত্রের নামে জমি গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ গোত্রের সদস্য বিশেষের নামে জমি থাকতে পারে না। প্রাইভেট প্রোপার্টি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে আমরা যা বুঝি, আফ্রিকান সমাজে সেবকম কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। পূর্বপুরুষের প্রথম পুরুষ যিনি ক্ষেত্রদেবতাকে অনুষ্ঠান ও ক্রিয়ার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করে জমির মালিকানা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন তাঁর গোত্রের প্রতীক অথবা ভিন্নভাবে বলা যায়, তাঁর গোত্রের সমস্ত নর-নারীর ব্যক্তিত্ব ও মানবিকতা তাঁবই চরিত্রের ভেতরে ফুল্ল অখণ্ড কুসুমেব মতো বিকশিত হয় আর এ কারণেই অস্পষ্ট ঈশ্বর থাকলেও আফ্রিকার সমাজ পূজো করে পূর্ব-পুরুষের, ঈশ্বরের নয়, এজন্যই মৃত ও জ্যান্ত, এ উভয়ই আফ্রিকার জনগণের কাছে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধেরও প্রতীক।

শুধু জমি নয়, জমিতে অবস্থিত বৃক্ষাদি, জন্তু-জানোয়ার এমন কি মানুষ পর্যন্ত গোত্রেব সম্পদ। সেঙ্ঘরের নিজের ভাষায়,

In Africa, then, there is no property rights in the soil and its wealth, not even right of possession, the term used by some anthropologists. There is simply 'right of use'. or if we must speak of owning, of 'usufractuary ownership',---- The saying of the Ashanti King is significant here, 'I am the grand-son of the land which owns the world. The real ownership belongs to the earth-spirit. The king or the 'Master of the land', the eldest descendant of the ancestor has only the 'use' and holds it on behalf of the community.

গোত্রের যৌথ উত্তরাধিকার থেকে সম্পত্তিকে বিচ্ছিন্ন করবার কোনো উপায় নেই (সেঙ্ঘরের ভাষায়,........you cannot alienate what dose not belong to you). আফ্রিকার সমাজে ব্যক্তি সম্পত্তির মালিক নয়, কিন্তু ফসলের মালিক। সে নদীর মালিক নয়, কিন্তু মাছ ধরলে তা তার মালিকানায় চলে যায়, সে বৃক্ষাদির মালিক নয়, কিন্তু সে সংগৃহীত ফলের মালিক। আইন-কানুন মেনে বন্য-জন্তু শিকাব করলে, তারও মালিকানা ব্যক্তির। একক বা যৌথভাবে ফসলের মালিকানা ভোগ করা যায়, কিন্তু কোনভাবেই সম্পত্তির উপর মালিকানা বর্তায় না।

রাষ্ট্রপতি সেঙ্ঘর আফ্রিকার সমাজে সম্পত্তি-সম্পর্কিত যে ধ্যান-ধারণা প্রচলিত আছে, তাকে গ্লোরিফাই বা 'মহত্ত্ব' দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যিক ভাষায় এ অবস্থার নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন,

শ্রম-শক্তি এখানে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না। শ্রম এখানে ভার বওয়া নয়, আনন্দের উৎস। কারণ শ্রম এখানে স্বাধীন, শ্রমকে এখানে গভীর পরিব্যাপ্তি দেয়া সম্ভব, শ্রম অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা আনে। আফ্রিকার সমাজে, আমরা লক্ষ্য করি, জমিতে কাজ করাকে সবচেয়ে মহৎ কাজ বলে গণ্য করা হয়। কেননা এ কাজই মানুষকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সমন্বিত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, এবং এ কাজ করা হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি-সমূহের তালে তালে। আফ্রিকানরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্মবোধ করে বলেই তার কাজকে করে তোলে ছন্দময় আর তার সঙ্গে থাকে বাদ্যযন্ত্র। হাজার হাজার কর্মসঙ্গীত, কৃষকের গান, রাখালিয়া গান, মাছ ধরার গান, কারিগর—শিল্পীর গান আছে আফ্রিকায়, এ গান দিয়ে হয় কাজের শেষ। আফ্রিকার কাজকর্ম, আফ্রিকার ছন্দ, আফ্রিকার আনন্দ কাজ থেকে মুক্তি পায় শুধুমাত্র কাজের মাধ্যমে।

অন্য আর একটি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি সেঙ্ঘর বলেছিলেন, একজন আফ্রিকান ইউরোপীয় বেশবাসে সুসজ্জিত হলেও যেইমাত্র ড্রাম বেজে উঠবে অমনি জ্যাকেটের ভেতরে আফ্রিকান রক্তের মধ্যে বেজে উঠবে দ্রাক্ দ্রিমি দ্রিমি তাল আর ছন্দ। তাঁর নিজের অনবদ্য ভাষায়, 'The African is as it were shut up inside his black skin'.

আফ্রিকার বিশ্বটাকে দরদী এবং অন্তরঙ্গ দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন রাজনৈতিক নেতা লিওপোল্ড সিদার সেঙ্ঘর। তাঁর জীবনের গোড়ার দিকের স্বপ্ন ছিল ফরাসী অধিকৃত দেশগুলো নিয়ে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র গড়ে তোলা কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। ফলে সেনেগাল রাষ্ট্রটিকে তিনি বাস্তব সত্য বলে গ্রহণ করলেন। তাঁর মধ্যে 'প্যান-আফ্রিকানিজম' প্রবল পরাক্রান্ত মতবাদ হিসেবে কাজ করেছে। সমগ্র আফ্রিকাকে সংগঠিত করে একটা কিছু করা যায় কি না, সেকথা তিনি বারংবার ভেবেছেন এবং তাঁর গদ্য লেখাতে এ আশা বারংবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তবে কবি হিসেবে তিনি যে-স্বপ্ন দেখেছেন, রাজনীতিবিদ হিসেবে সে সব স্বপ্নকে সর্বদা বাস্তবায়িত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

রাজনীতিবিদ হিসেবে সেঙ্ঘর তীক্ষ্ণভাবে সচেতন এবং ফরাসী ভাষায় তাঁর দখল ও পাণ্ডিত্য থাকার ফলে বিশ্বের সমস্ত রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে পড়াশোনা করবার একটা বিশেষ সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। এবং এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তিনি দ্বিধা করেননি। জাতীয়তাবাদকে তিনি আফ্রিকার বিশেষ রিয়ালটি বা সত্য বলে ঘোষণা করেছিলেন ঘানার পার্লা-মেন্টে (রাষ্ট্রপতি নক্রুমার আমলে) প্রদত্ত তাঁর বিখ্যাত ভাষণে, তিনি বলেছিলেন,

You President Kwame Nkrumah, unlike the superficial followers of Marx and Engels, has always believed that the nationalism which shaped nineteenth century Europe was not an outdated idea, that the nationalist idea expressed and still expresses today, the essential reality of Africa

রাষ্ট্রপতি সেঙ্ঘর জাতীয়তাবাদী হলেও মার্কস ও এঙ্গেলসের অন্তরঙ্গ পঠন-পাঠন করেছেন এবং সর্বদা নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন মার্কস উদ্ভাবিত শ্রেণী সংগ্রামের পথ আফ্রিকার পথ নয়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

Dictatorship of proletariat? This is just playing with words : there would have to be proletariat and a capitalism at war with it, to use Marx's expression. Now in our Afro-Arab-society, as we have seen and cannot overstress, there are no classes at war ---

তবে তিনি মনে করেন, আফ্রিকার দেশগুলো নিজ নিজ পথে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলবে, কিন্তু কমিউনিজম নয়। মার্কসীয় মতবাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গি অনুকম্পামিশ্রিত.

What should be our attitude towards Marxist humanism be? I would answer. first of all, not to betray it when it can make a fruitful contribution and where our trust in it can make for an increase in lucidity.

রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর মত হলো এই যে আফ্রিকায় শ্রেণীবিভক্ত কোনো সমাজ নেই. কাজেই শ্রেণী সংগ্রামের শ্লোগান এখানে অহেতুক, আফ্রিকা মহাদেশকে কোন শ্রেণী শোষণ করেনি, করেছে একটি মহাদেশ

আর একটি মহাদেশকে। তিনি মনে করেন প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব বাস্তব অবস্থা আছে এবং তারই ভিত্তিতে সে রাষ্ট্রে বা দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন চীন এবং ইসরায়েলের। তাঁর বক্তব্য থেকে একথা বুঝতে কোন অসুবিধে নেই যে, আফ্রিকায় সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তাঁর বক্তব্য,

'African statesmen like those in the West-Indies and Latin America have for the most part chosen the socialist state....socialist, not communist I have tried to show that African civilization is a collectivist and communal civilization : it is socialist.'

শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি সেঙ্ঘরের সেনেগালে নয়, সমগ্র আফ্রিকার দেশে দেশে জাতীয়তাবাদীরা সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণের জন্য উৎসুক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রশ্ন ও বিতর্কও যে আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। একদিকে সমগ্র আফ্রিকার জনগণ ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম করে স্বাধীন হচ্ছে, তেমনি তারা বীরের মত লড়ছে বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে। বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বর্তমান লড়াই শেষ হলে আফ্রিকার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হবে উপনিবেশবাদ এবং দেখা দেবে আফ্রিকার নিজস্ব সংস্কৃতির প্রবল বিকাশ। রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রপতি সেঙ্ঘর পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে কখনো ঘৃণা করেননি। কিন্তু যা কিছু আফ্রিকান, তাকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা আছে তাঁর গদ্য ও কবিতায়। Africanism, Africanness. negritude প্রভৃতি শব্দের মধ্যে আফ্রিকান সত্য অনুসন্ধান করেছেন কবি সেঙ্ঘর। এসব শব্দের মধ্যে তিনি আফ্রিকার জনগণের নিজস্বতাকে খুঁজে ফিরেছেন। তিনি সেনেগালের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ও সবচেয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ খ্রীষ্টানদের সম্পর্কেও ভেবেছেন এবং এই বলে মন্তব্য করেছেন ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মের মহৎ মানবিকতাকে গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু আফ্রিকান নিজস্বতাকে আঘাত করা চলবে না। মুসলিমদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন,

African Moslems must work to restore to Islam its mystic and humanistic leaven while bringing it into harmony with the African spirit.

যাই হোক, আফ্রিকার স্বকীয়তা তুলে ধরার জন্য কবি সেঙ্ঘর তাঁর জীবনের সেরা বছরগুলিকে ব্যয় করেছিলেন, তাঁর কবিতায় এর অঢেল পরিচয় বিদ্যমান। সেনেগালের জনগণের প্রতি নিবেদিত একটি কবিতায় তিনি যা বলেছিলেন, সেটা উপস্থিত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

তোমরা, সেনেগালেব জনতা, আমার কালো ভাইয়েরা
বরফ আব মৃত্যুতেও উত্তপ্ত তোমাদের হাত,
আমি ছাড়া কে তোমাদের গান গাইবে, তোমাদের সহযোদ্ধা
তোমাদের ভাই এবং তোমাদের সঙ্গে যে রক্তস্নাত।

না, আমার ভাষণ এবং বক্তৃতা মন্ত্রী আর জেনারেলদের
হাতে তুলে দিতে চাইনে।
না, সামান্য অনুকম্পামিশ্রিত প্রশংসায় ও অন্ধকারে
তোমাদের মৃত্যু হবে।
তা আমি হতে দিতে চাইনে।

কবিতাংশ

সিনের রাত

হে রমণী, আমার কপালে রাখো পালক কোমল হাত সুবাসিত।
সুদীর্ঘ তালের সাত ছুঁয়ে বয় রাত্রির হাওয়া
কিন্তু তোলে না মর্মর। নেই গান ঘুম পাড়ানিয়া।
তবু দোল, তবু দোল, নিঃশব্দ সঙ্গীতে।
শোনো গান, শোনো, আঁধার শোণিতে তাল, শোনো,
নামহীন গ্রামে গ্রামে আফ্রিকার আঁধার স্পন্দন।
এখন ক্রমশঃ চাঁদ ভারী ক্লান্ত, ডুবে যাচ্ছে জলে,
এমনকি ঘুমে স্তব্ধ হাসির জররা
অভিভূত মাথা নাড়ে চারণ কবিরা
যেন শিশু জননীর পিঠে।
নিদ্রায় আক্রান্ত হয়, হয়ে আসে নর্তকীর চঞ্চল চরণ।
ক্রমশঃ জড়িয়ে আসে গায়কের স্বর।
এইতো তারার কাল, নিশীথের কাল, এখন হেলান দিয়ে
স্বপ্ন দেখে নিশীথিনী ধবল শেমিজ পরে মেঘের পাহাড়ে।
বাড়িগুলো, ঠিকরে পরে ছাদ থেকে দ্যুতি ;
নক্ষত্রলোকের সাথে অমন প্রত্যয় নিয়ে বলছে কি তারা ?
বহুক্ষণ নিভে গেছে চুলো
ঘরের ভেতরে ঘন মিঠে-কড়া ঘ্রাণের সংসারে।
রমণী, প্রদীপ জ্বালো পরিশ্রুত তেলে,
বিছানায় শুয়ে শুয়ে বড়দের মতো
শিশুরা করুক গল্প পূর্বপুরুষের।
শোনো কণ্ঠ এলিসার প্রবীণ প্রাচীন।
তাঁরা ঠিক আমাদেরি মতো, নির্বাসিত,
তবু তো চায় নি মৃত্যু। পাছে

বীর্যের প্রবল নদী মরুপথে হারায় প্রবাহ।
অমর আত্মার যদি শুভ আবির্ভাব ঘটে আজ
আমাকে শুনতে দাও পদশব্দ ধোঁয়াগাঢ় এই কুঁড়ে ঘরে।
হে রমণী, অগ্নির জ্বলন্ত বল যেন মাথা রেখে
তোমার বুকের পরে শুয়ে আছি আমি।
আমাকে এখন তুমি নিতে দাও মৃতের সুবাস,
চৈতন্যে মাখতে দাও, বারবার আবৃত্তি করতে দাও,
তাদের জীবন্ত বাণী, আর আমাকে শিখতে দাও
বাঁচার সে মন্ত্র, যেন শিখে নিতে পারি
ঘুমের অতল জলে ডুবুরীর মতো ডুবে যাবার আগেই।

তোমার হাতের পেয়ালায়

যোদ্ধার সেই কালোবরণ মুখ তুমি ধরেছিলে তোমার
দু'হাতের পেয়ালায়।
গোধূলির ইন্দ্রজালে তা মনে হলো তরল আলো।
পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আমি সূর্যাস্ত দেখলাম
তোমার চোখের সৈকতে।
আবার কবে স্বদেশ দেখতে পাবো?
দেখতে পাবো তোমার মুখের অবাধ দিগন্ত?
আবার কবে ফিরে বসবো তোমার স্তনের টেবিলে?
একান্ত সিদ্ধান্তগুলো বাসা করে সংগোপনে ছায়ায় ছায়ায়।
আমি তো দেখব অন্যতর আকাশ, অন্যতর চোখ,
পান করবো লেবুর চেয়েও তাজা অন্যতর ঠোঁট থেকে,
এবং ঘুমিয়ে থাকবো ঝড়ের মধ্যে অন্য কারো চুলের আশ্রয়ে।
কিন্তু প্রতিবছর বসন্ত এসে ধমনীতে আগুন জ্বালায়;
আমি নতুন করে শোক করবো আমার জন্মভূমির জন্যে,
তৃষাদীর্ণ সাভানায় তোমার অশ্রুবৃষ্টির স্মরণে।

অনুবাদ : সৈয়দ শামসুল হক

জনৈক রাজবন্দীর কাছে চিঠি

এন্‌গোম! শাবাশ্‌ তাইনের বাহাদুর!
তোমাকে অভিবাদন, এন্‌গোম।
গ্রাম সুবাদে আমি তোমার প্রতিবেশী,
এমনিতে তোমার হৃদয়ের পড়শী।
নিক্ষিপ্ত তীরের মতো ছুঁড়ে দিলাম অভিনন্দনঃ
শুভ্র, ঘৃণা আর পাপের কাঁটাওয়ালা তারের ওপর
ভোরের চীৎকারের মতো শাদা,

তোমারই নামে এবং নামের মহিমায় আমি তোমাকেই নির্দিষ্ট করি
তাসামির দারগুই এন্‌দায়েকেও আমার অভিনন্দন,
যিনি জিভকে ধারালো, আঙুলগুলো সরু এবং লম্বা করার জন্য
কাগজ ভোজন করেন
অভিবাদন করি সম্বা দ্যমাকে---
যার কন্ঠে অগ্নিশিখার দ্যুতি
যার কপালে আঁকা নিয়তির তিলক-চিহ্ন।
এন্‌আন্‌ট্‌ এম্‌বোদাই এবং কলি এন্‌গোম
তোমাদের নামের জন্য তাঁদেরকেও অভিনন্দন জানাই
এমন লগ্নে
যখন দারুণ মারণাস্ত্রও প্রখর রোদে
শীর্ণ ডালপালার মতো করুণ হ'য়ে উঠছে
আর সন্ধ্যায় কাঁপতে কাঁপতে বন্ধুত্বের খাদ্য জোগার করছেন।

আমি আমার নির্জন বাড়ি থেকে তোমাদেরকে লিখছি,
যে-বাড়ির ওপর রয়েছে কড়া পাহারা।
আমার কালো চামড়ার জন্য আমার সুখের বাড়ি।

ভাগ্যবান বন্ধুরা আমার, বরফের দেওয়াল
এবং উজ্জ্বল কামরা সম্পর্কে
তোমরা কোনোদিন ভাবতেও পারো নি ---
আমাদের পূর্বপুরুষদের মুখোশগুলোর ওপর বোনা বীজগুলোকে
ওরা বন্ধ্যা ক'রে দিয়েছে
আমাদের প্রেমের সুখস্মৃতিগুলোকে ওরা নির্বীজিত করেছে।
যারা কোনোদিন স্বাদ পায় নি
ভালো শাদা রুটির
দুধের
আর লবণের,
পুষ্টিকর খাবারে যাদের দেহ বেড়ে ওঠেনি ঃ
যা সমাজকে বিভক্ত করে ---

রাস্তায় রাস্তায় জনতা,
তন্দ্রাতুর পদাতিকেরা মানুষের চিহ্নগুলোকে অস্বীকার করে,
পরিবর্তনের বোবা গিরিগিটি এবং তাদের লাজলজ্জা
তোমাদের নির্জন কারাগারে আটকা পরে আছে।
তোমরা কখনো রেস্টোরেন্ট দ্যাখো নি
ভালো হাম্মামখানা তো দ্যাখো নি
কালো রক্তকে মেনে না নেওয়ার আভিজাত্য
তাও দ্যাখো নি,
কালোর সীমানা জুড়ে রয়েছে বিজ্ঞান এবং কলাবিদ্যা
আমি কি জোরে, আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠবো?
তোমরা কি আমার কথা শুনছো?
আমাকে কিছু একটা বলো।
ভাইয়েরা আমার, আমি আর শাদা মানুষকে স্বীকার করিনে।
সিনেমায়--এই সন্ধ্যায়--তারা আমার অনেক দূরে,
শূন্যতায় হারিয়ে গেছে
আমার চামড়া থেকেও তারা দূরে।

মৃত্যুর মতো, দুঃখের মতো, এক ঘেয়ে বিরক্তির মতো
আমার গ্রন্থটি শাদা
আর এজন্যই আমি লিখি।
চুলার পাশে আমার জন্য একটু জায়গা রেখো,
গরম থাকা অবস্থাতেই আমার জায়গায় আমাকে ফিরতে দিও।
আমার হাত স্পর্শ করতে দাও
যে রকম বন্ধুত্বে গরম ভাপ ওঠা ভাতের মধ্যে আমরা হাত রাখি।
প্রাচীন অসাড় শব্দ মুখে মুখে বন্ধুত্বের বাঁশির মতো ধ্বনিত হোক।
দারুগী নিক আমাদের কাছ থেকে তার ফলের রসের ভাগ----
এ-সবের আধিক্যই শুষ্কতাকে সুরভিত করে।
তুমি, বিশাল আফ্রিকার নাভির মতো তোমার প্রবল প্রচুর উদ্ভাবনী--শক্তি,
আমাদেরকে দাও।
গায়কেরা আজ সন্ধ্যায় আমাদেরকে ঘিরে-রাখা পূর্বপুরুষদের
আহবান করবে?
তারা কি অরণ্যের শান্তিকামী জানোয়ারদেরকেও ডাকবে?
নক্ষত্রের চোখের পল্লবে যে-স্বপ্ন তির-তির করে
তাকে কি সাজাবে?
এন্‌গোম! নূতন চাঁদের রান্নারের কাছে এর একটি জবাব দিয়ে দিও
তোমার অকপট আশঙ্কাময় নির্দেশের অগ্রবর্তী থেকেই আনেন
রাস্তার মোড়গুলো আমরা পেরোতে থাকবো।
পাখির খাঁচার জানালার মতোই সংহত আর সরল তোমার কথাগুলো।
বিজ্ঞজনেরা হাসছেন, আমার জন্য তাঁরা ফিরিয়ে আনেন সত্য
যে-সত্য বাস্তবের অধিক, তাঁদের শুভেচ্ছা আপনা থেকেই ঝ'রে যায়।
যখন প্রদোষের ফিন্‌কি আলো মৃত্যুর আঁধারকে খানখান করছে
তখন — তখনই তোমার চিঠির জন্য আমার ব্যাকুল প্রতীক্ষা।
ধলপহরের ওজুর মতো, বিহানের শিশিরের মতো তোমার চিঠি----
আমি মাথা নুয়ে গ্রহণ করবো।

গভর্ণর ইবুইর প্রতি

সমুদ্রে ও দ্বীপাঞ্চলে প্রাগ-মধ্যাহ্ন সূর্যের
শ্বেত রোদনের মতো
শাদা ঈগলগুলো গর্জন ক'রে উঠেছিলো।
সিংহ তার জবাবও দিয়েছে,
অরণ্যের যুবরাজ মধ্যাহ্নের জড়তা ভেঙে
এনে দিলো উজ্জীবন,
তুমি তো প্রস্তর, ইবুই!
তোমার ওপর গ'ড়ে ওঠে স্মৃতিসৌধ,
আমাদের অনন্ত আকাঙক্ষা লতিয়ে ওঠে তোমাকে ঘিরেই,
'প্রস্তর' সে তো তোমার নামের অর্থ
আমি বলি তুমি আর ফেলিক্স নও
এখন তুমি পিটার ইবুই,

শিকারের তরুণ দেবতারা জেগে উঠেছেন
চোখ রাখছেন চোখের ওপর
ছুটে যাচ্ছে বিদ্যুতের ঝলক,
ছুঁড়ে মারলেন ঝঞ্ঝা, সুগঠিত দলগুলোর ওপরে
বাজপাখির দাপাদাপি—
চরাচর থর থর ক'রে কাঁপলো
গর্বের বিশাল গৌরব থেকে দূরে, অনেক দূরে,

ইবুই, তুমিই সিংহ, তোমার আছে তীক্ষ্ণ গর্জন,
সেই সিংহ যে শক্ত পায়ে দাঁড়ায়
আর গর্জন করে 'না!'

তুমিই সেই কালো সিংহ যার রয়েছে প্রেরিত পুরুষদের মতো চোখ,
তুমি সেই কালো সিংহ যার নাম সনঘাইর আশিকার মতো
মর্যাদা এবং সম্মানের সঙ্গে যুক্ত
তোমার রাষ্ট্রীয় মুকুটে স্মিতহাসির পালক।
তুমি, আমার একান্ত আফ্রিকার সরল অহঙ্কার
এখন তোমার স্কন্ধে রয়েছে
আফ্রিকার তিন শতাব্দীর ঘাম
এবং আফ্রিকার শেষ সম্মান।
ইবুই, তুমি সেই বিরল পাথর, যার শরীরে শ্যাওলা জমে
কেননা তুমি এখন স্মৃতিসৌধে স্থির,
তুমিই উত্তেজনা আর আন্দোলনের প্রতীক।
হাজার হাজার জনতা আর হাজার হাজার জিভ
তোমার রক্তিম বিশ্বাসের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে নিজেদের
উচ্চারণ
দ্যাখো, এই আগুন ঃ
মরুভূমি এবং অরণ্যের লেলিহান শিখা
হেরো আফ্রিকার নব-উত্থান,
কালো আর বাদামী রঙের বোনদের উজ্জীবন,
আফ্রিকা এখন শাদা ইস্পাত নির্মাণ করে --
একটি আকাঙক্ষা মঞ্জুরিত ঃ আফ্রিকা জিন্দাবাদ
আর এরই জন্য আফ্রিকার ভাণ্ডারে রয়েছে
অনেক অনেক কালো বিসর্জন।

অনুবাদ ঃ আসাদ চৌধুরী

ক্যাম্প ঃ ১৯৪০

অকস্মাৎ এক ঝড়ো সন্ধ্যায় ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গ্যালো
প্রেমিকদের সাজানো বাগান
শ্বেত লাইলাকরা হলো ভূলুণ্ঠিত

লিলিফুলের গন্ধ মিলিয়ে গ্যালো দূর সীমায়, এবং
ভালোবাসা দক্ষিণের নদীর সমীরণ আবৃত দ্বীপে হলো অন্তর্হিত

মদিরা এবং সঙ্গীতের স্থির চঞ্চল দেশের
এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি
দুর্যোগের দিশেহারা ক্রন্দন তীর তীব্র বেগে ব'য়ে গ্যালো
বিজলির অসি চিরে দিলো দেশের হৃদপিণ্ড পূর্ব থেকে পশ্চিমে

কাদামাটি আর ডালাপালার কুটির ভরা বর্ধিষ্ণু গ্রাম
দুটি পূতিগন্ধময় ডোবায় এখন আবদ্ধ
গ্রীষ্মের অসাড় দাহন সেখানে
ঘৃণা এবং ক্ষুধাকে পরস্পর মর্দন করছে
এখন কাঁটা তারের হিম আক্রোশে পরিবেষ্টিত
একটি গ্রাম, এবং
জাঁদরেল যোদ্ধারা তখন পোড়া সিগারেট প্রার্থনা করছে
হাড় থেকে হাড়ে কুকুরের যুদ্ধ-চিৎকার
কুকুর বিড়ালের পাওনা হিস্যা নিয়ে ওরা চিন্তামগ্ন, কিন্তু
শুধু অট্টহাসির নিষ্প্রাণ মেজাজ তারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে
শুধু অগ্নিঝরা ইচ্ছার স্বাধীনতা তারা পুষে রেখেছে
সন্ধ্যা নামে, রক্তমোক্ষণের যন্ত্রণায় কাতর আকাশ
জন্ম দিচ্ছে রাত্রির
ওরা ওদের মহান গোলাপি শিশুদের ওদের মহান সোনালি শিশুদের
ওদের শ্বেত শিশুদের পাহারা দিচ্ছে
দুশ্চিন্তার ডাঁশ এবং বন্দীত্বের পোকার ভয়ে ভীত ওরা ঘুমে ঢুলছে।

আফ্রিকার সন্ধ্যা-মেশা অন্ধকার গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে
গল্প বলার ফিস ফিস কণ্ঠস্বর দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে
নৈঃশব্দের সরণিতে
এবং মৃদু সেই ঘুম পাড়ানিয়া গান—
গানের সাথে বাজনা নেই

নেই কালো হাতের করতালির অবিরাম সঙ্গত- - - -
তা হবে আগামীকাল দুপুরের ঘুমের সময়
স্বপ্ন যখন সূর্যরশ্মির শোভাযাত্রার সাথে ধূ ধূ নিষ্পাদপ

প্রান্তর এবং অসীম বালুকারাশি অতিক্রম ক'রে যাবে।
বাতাস ছুঁয়ে-ছুঁয়ে গাছগুলো এখন গিটারের মতো বেজে যাচ্ছে
এবং কাঁটাতার এখন বীণা-তারের চেয়ে ঢের বেশি সুরেলা
ছাদগুলো নীচে কান ঠেকিয়ে শুনছে
দূরে বহুদূরে নিদ্রাবিহীন আঁখিজুড়ে নক্ষত্রের অবিরাম হাসি
ওদের চোখগুলো এখন অন্ধকার
অন্ধকারের মতো নীল ওদের চোখ
কাদামাটি আর ডালাপালার কুটির ভরা গ্রামে
বাতাস হাল্কা সুরে ডাক দিয়ে যাচ্ছে
এবং মাটি পেয়ে যাচ্ছে শান্ত্রীর মতো মানবিক শরীর
পথ হাতছানি দিচ্ছে স্বাধীনতার

ওরা তো যাবেনা। দেহের ক্লান্তি আর কর্তব্যের উল্লাস
ফেলে ওরা যেতে পারে না
মহৎ জন্ম যাদের তারা ছাড়া আর কে করবে
এই অকারণ নিকৃষ্ট কর্তব্য?

খাবারের টিন বাজানোর তালে তালে রবিবারে
কারাই বা নাচবে?
ওদের প্রত্যাশিত স্বাধীন পথে যাবার জন্য ওরা কি স্বাধীন নয়?

অকস্মাৎ এক ঝড়ো সন্ধ্যায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গ্যালো
প্রেমিকদের সাজানো বাগান
শ্বেত লাইলাক হলো ভূ লুণ্ঠিত
লিলিফুলের গন্ধ মিলিয়ে গ্যালো দূর সীমায়, এবং
ভালোবাসা দক্ষিণের নদীর সমীরণ আবৃত দ্বীপে হলো অন্তর্হিত।

অনুবাদ : আসাদ চৌধুরী
[ফরহাদ খানের সহযোগিতায়]

শিশু শল্যাম্বিতের শোকগাথা

[রাত্রি সঙ্গীত]

হে শিশু বেলার রাত্রি, নীলাভ স্বর্ণাভ রাত, হে চাঁদ
কতবার আমি ডেকেছি তোমাকে, হে রাত্রি, কেঁদে, কেঁদে,
আমার পৌরুষের দুঃখের পাশে, চলমান পথটির পাশে
আমি কি কাঁদি নি?

খুব নির্জন---চারিধারে খুব বালিয়াড়ি

সেই রাত প্রাক শৈশবের মত-শান্তি-ঘন
সিংহের হাঁক শুনে আমরা পিঠ কুঁকড়ে নিতাম
দীর্ঘাকৃতি ঘাসেরাও নুয়ে পড়ে চলিষ্ণু রাত্রির বাক্‌শূন্যতার কাছে

শাখালগ্ন অগ্নি, ওগো আশার আগুন, সূর্যদেবের ক্রমম্লান স্মরণ
অপাপবিদ্ধ শৈশবের স্মৃতি কোজাগর, হে রাত্রি তুমি আমার
নিষ্পাপ বোধ উচ্চকিত করো।

O O O

মোটেই তা নয়! আমিত মরেই গিয়েছিলাম--
মৃত্যুভীতা কিশোরীর মত আমার হাত উঠেছিলো আমার কণ্ঠে।

সঙ্গীতের অরূপতার প্রতি আমাকে মরে যেতে হলো
আর
সবকিছুইত মৃত্যুর স্রোতে বয়ে চলে যায়।
নীল কপোতের আহবানে ঘুঘুর ওঠানো গ্রীবার গোধূলি রং
করুণ ক্রন্দন ধ্বনি উঠিয়ে স্বপ্নের মধ্যে ওড়ে সমুদ্র পাখিরা

O O O

চলো আমরা মরে যাই, চলো আমরা নৃত্যরত হই।

কনুয়ে কনুয়ে গ্রথিত হয়ে চলো আমরা একটি পুষ্পমাল্য হয়ে উঠি

আনগ্ন—
যেন পোষাক আমাদের পদচ্ছন্দ না আটকে দ্যায়
আশ্বাসের আলোয় রেঙে ওঠে
মেঘদল আচ্ছাদিত অশনির মত
মাদল ধ্বনি যেন কুপিয়ে তোলে পবিত্র নীরবতা
নাচো! গানের চিৎকার রক্তের স্রোত ছুঁয়ে যাক চাবুকের মত
দমবন্ধ ভয়ার্ততাকে ক্রমশ তাড়িয়ে নিয়ে যাক্ ছন্দের বল্লম

জীবন তাড়িয়ে নিয়ে যায় মৃত্যুকে—
নাচো!

ভয়ের বোঝা কাঁধে স্পন্দিত হই নৃত্যে
যেন লিঙ্গের প্রতি নিবেদিত রাত্রি ক্রমে বেড়ে ওঠে
আমাদের নির্জ্ঞান নিষ্পাপ অজ্ঞতার ওপরে।

হায় শৈশবের কাছে আমাদের মৃত্যু হোক্
কবিতারও তবে মৃত্যু হোক্
বাক্যের বিন্যাস ভেঙে চুরে যাক
সমস্ত অপ্রয়োজনীয় বাক্যাবলী বিস্মৃত হও!
ছন্দস্পন্দতাইত যথেষ্ট, বাক্যের সিমেন্ট দিয়ে
ভবিষ্যতের শিলাময় পর্বতে প্রয়োজন নেই কোন শহর নির্মাণ

ছায়াচ্ছন্ন সমুদ্রগর্ভ হতে এসো সূর্য উত্থিত হও।
শোনিত তরঙ্গগুলি করো উষালগ্নের রং।
হে ঈশ্বর তবু কতবার আমি বিলাপরত
কতবার আমি শোকার্ত হলাম
শৈশবের স্বচ্ছতার প্রতি
মধ্য সূর্যে পৌরুষ সেই লগ্ন
যে দণ্ডে আত্মা সমস্ত মাংস নিংড়ে নেয় সমূহ আকার থেকে

যেন শীতার্ত নগ্ন তরুরাজি ইউরোপের সূর্যের নীচে।
অস্থিমালা খুবই বিমূর্ত তীক্ষ্ণ সরল সূক্ষ্ম গূঢ়
কম্পাস এবং কাঁটা দিয়ে ওদের খুঁজে বের করতে হয়।

আঙুলের ফাঁক দিয়ে বালিকণার মত জীবন গড়িয়ে যায়
বরফের চাঙ্গ হয়ে ওঠে বন্দীজীবন স্রোত
অবশ বেতস লতার হাতের সর্পিল জলধারা পিছলে ছুটে চলে

o o o

প্রিয় রাত্রি, সখারাত্রি, শিশুরাত্রি, সমুদ্র সমতলে
গহীন বনরাত্রি, প্রেতায়িত রাত্রি, চোখের ঘুমে জড়ানো রাত্রি
হে রাত্রি তোমার বসতি ডানাভরা, তোমার নিশ্বাসপুঞ্জ ধ্বনিময়তার

নিশ্বাসে নিশ্বাসে টেনে নেওয়া প্রাণময় নিস্তব্ধতা
বলো, কতোবার আমি করুণ এবং আর্দ্র হয়েছি
আমার মধ্য সূর্যের দিনে?

কবিতার ফুল মুদ্রিত হয় মধ্যদিনের রৌদ্রে
প্রদোষের শিশির পতনে তারা উন্মোচিত
আবার মাদল ধ্বনি রসময় ছন্দ বাজিয়ে তোলে
পাকাফলের গন্ধময়তার নীচে ---

o o o

নবাগতের শিক্ষা শুরু! আমি জানি
তোমার অভিজ্ঞতাই আমাকে সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে ভাষা দেবে
আমাকে পিতা হতে শিক্ষা দাও। আমাকে পরিচালক হতে দাও
বলে দাও
কোন ক্ষেতে আমি ফসল ফলাবো?
কোথায় শস্যের ভাগাভাগি হবে
কোথায় আমি চাষী এবং অনাথ কাউকেই প্রতারিত করবোনা
আমাকে বলে দাও হে যাজক ----

এই সঙ্গীত কোনো যাদু-টোনা নয়
এই সঙ্গীতে আমার কোঁকড়ানো চুলের মাথাগুলো পরিপক্ব হয়

এই কবিতা একটি উড়ন্ত সাপ
অন্ধকার এবং ঊষালগ্নের দাম্পত্য
ফিনিক্স উঠে আসছে—সে গান গাইবে
ডানা ছড়িয়ে গান গাইবে
বাক্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর ডানা ছড়িয়ে—

শান্তির স্তব

১.

প্রভু যিশু, বইটির সমাপনীতে আমি তোমায় এনে দেবো দুঃখের
উৎসর্গ পেয়াল।
মহাবর্ষের প্রারম্ভে, প্যারিসের বরফঢাকা ছাতগুলোর উপর শান্তির সূর্য
যদিও আমি জানি— আমরাই সহোদর শোণিতে রঞ্জিত হবে হলুদ প্রাচী,
প্রশান্ত মহাসাগর
ঝড় এবং ঘৃণায় অপরিচ্ছন্ন হবে—
আমি তো জানি এই রক্তই বসন্তকালীন পবিত্র উৎসর্গ, সাতদশক ধরে
মেদস্ফীত রাজনীতিকরা
এই রক্তপাতই সাম্রাজ্যবাদের জমিসেচ করেছে—
হে প্রভু, এই ক্রুশের পায়ের তলায়—আজ শুধু তুমিই ক্রুশবিদ্ধি নও,
শুধু তুমিই মন্ত্রণাসিক্ত মহীরুহ নও—আজ পুরাতন এবং নতুন বিশ্বে
আফ্রিকা ক্রুশবিদ্ধ, প্রভু!
সেই ক্রুশের দক্ষিণহাত আমার দেশের ওপর ছড়ানো, তার বামহাতের
এক ছায়া আমেরিকাতে
প্রিয় হাইতিই হচ্ছে এই ক্রুশের প্রিয়তম হৃদয় যারা অত্যাচারীর
বিরুদ্ধে মানবতার মন্ত্রপাঠ করেছে

আমি নতজানু এই বিশাল ক্রুশের পদতলে—চারশতাব্দীর লাঞ্ছনামণ্ডিত
আফ্রিকা
তবু জীবন্ত
তোমার কাছে আমি প্রার্থনা করি, হে প্রভু, আমি আফ্রিকার শান্তি
এবং মার্জনা ভিক্ষা করি

২.

প্রভু, হে ঈশ্বর, শ্বেত ইউরোপকে ক্ষমা করো
যদিও আলোকিত চার শতাব্দী, চার শতকের মহানুভবতার নামে যে
তার ঘেউ ঘেউ করা শিকারী কুকুরের দল চারিয়ে দিয়েছে আমার
মাতৃভূমিতে
এবং যিশুর সেবকেরাই তোমার আলোক এবং মমতা ভুলে গেছে
আমার বই পুড়িয়ে ওরা সৈন্যছাউনির আগুন সৃষ্টি করেছে, আমার
ছাত্রদের ওরা অত্যাচার করেছে
যদিও আমার চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীদের ওরা দেশত্যাগী করেছে—ওদের
ক্ষমা করো
ওদের বাদরু এক পলকে ঝলসে দিয়েছে টাটাস গোত্রের গর্ব এবং
সম্মানের পাহাড় উড়িয়ে দিয়েছে

তাদের গুলির ছররা দিনের আলোর মত ছিটকে পড়েছে বিশাল
সাম্রাজ্যের অস্ত্রে অস্ত্রে
পশ্চিমের চোঙা থেকে তারা ছিটকে গেছে পূর্ব দিগন্তে—টকটকে লাল।
অসূর্যম্পর্শ গহীন বনানীতে তারা রক্তপিপাসু শিকারীর উৎসব রচনা
করেছে
পবিত্র শান্তি দাড়ি ধরে তারা হেঁছড়ে টেনে এনেছে আমার প্রপিতামহের
আত্মার আর্তনাদ
তোমার পবিত্র প্রক্ষালনকে তারা ঘুমন্ত মধ্যবিত্তের অলস রবিবাসরীয়
স্ফূর্তিতে বিবর্তির করেছে
হে প্রভু! ওদের ক্ষমা করে দাও যারা আস্কিয়াকে বানিয়েছে
ম্যাকি সাদ
যারা সার্জেন্ট মেজর বানিয়েছে আমার গর্বোৎফুল্ল রাজপুত্রদের।

আমার গৃহভৃত্যকে যারা 'বয়' বানিয়েছে, আমার প্রশান্তকে যারা
বানিয়েছে বেতনভুক
আমার জতিকে যারা করেছে পদানত শ্রমিক মাত্র!
বুনো হাতির মত যারা আমার শিশুদের করেছে তাদের তোমাকে
ক্ষমা করতেই হবে, হে প্রভু
তারা ক্ষমা চায় প্রভু--যারা আমার সন্তানের পিঠ চাবুকের আঘাতে
দুমড়ে দিয়েছে
যারা আমার সন্তানদের বানিয়েছে সাদাচামড়ার সেবাইত মাত্র
তারা যারা আমার এককোটি সন্ততিকে তাদের কুষ্ঠাগারের মত
ঘ্যানঘেনে জাহাজের খোড়লে চালান দিয়েছে
যারা আমাদের দুই কোটিকে হত্যা করেছে
যারা আমার বার্ধক্যকে ঠেলে দিয়েছে রাত্রির নির্জন অরণ্যে
এবং দিনের খসখসে তৃণভূমিতে
হে প্রভু, আমার চশমাবাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসছে—
আমার কলজের মধ্যে ফণা বিস্তার করছে ঘৃণার সেই সাপ, প্রভু,
দ্যাখো!
আমি তো ভেবেছিলাম সে কবে মরেই গেছে!

৩.

সেই সাপকে তুমি আঘাত করো হে প্রভু, কারণ আমি আমার মত
বাঁচতে চাই
আর আজ—আজ আমি বিশেষভাবে প্রার্থনা করবো ফ্রান্সের জন্যে

হে প্রভু, ফ্রান্সকে রক্ষা করো, তাকে প্রকৃত পরিচালকের হাতে ফিরিয়ে দাও
সেও তো ইউরোপ, সেও তো ডাকাত বাহিনীর মত আমার সন্তান কেড়ে
নিয়েছে
তার শস্যক্ষেত্রে জোগাল দেবার জন্যে, তার তুলোর খামারে ঘর্মপাত
করার জন্যে
কারণ নিগ্রোস্বেদ যে গোবরের মতই উপাদেয় সার।
ফ্রান্সও নিয়ে এসেছে মৃত্যু এবং বন্দুকের টোটা আমার নীলাভ শান্ত
গ্রামগুলোতে

আমার জাতি গোত্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছে হিংস্র শত্রুতা,
তাদেরকে কুকুরের মত কামড়া-কামড়ি করতে শিখিয়েছে শুধু একটি
হাড় নিয়ে
আমার মুক্তিযোদ্ধাদের ওরাও ডাকাতের সম্মান দিয়েছে
এবং থুতু ছিটিয়ে দিয়েছে মুক্তির কারিগরদের মাথায়
হ্যাঁ, প্রভু তুমি ফ্রন্সকে ক্ষমা কর যারা মুখে মুক্তির কথা বলে
এবং গোপনে সুড়ঙ্গ কাটে
যারা আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিজের খাবার সঙ্গে আনবার জন্যে
ডানহাতে দান করে যে ফ্রান্স বামহাতে ফিরিয়ে নেয়—ক্ষমা করো তাকে
হ্যাঁ, প্রভু, ক্ষমা করো সেই ফ্রান্সকে যে নিজের দেশের হানাদার বাহিনীকে
ঘৃণা করে
কিন্তু নিজেরাই হানা পাড়ে অন্যের ভূমিতে, আমাকে পদানত রাখে
যারা গর্বে মদমত্ত হয়ে ফটক উম্মুক্ত করে নিজের বীর সৈন্যদের জন্যে
অথচ সেনিগালের যোদ্ধাদের তারা ভাড়াটিয়া সৈন্যের মর্যাদা দ্যায়
যারা সেনিগালের সৈন্যদের সম্রাজ্যবাদের কালো কুত্তার মত তৈরি-
করেছে ক্ষমা করো সেই ফ্রান্সকে।
যে ফ্রান্স নিজে রাজতন্ত্রের বিরোধী কিন্তু তারা অন্যের দেশ দখল
করার পরওনা দেয় বাণিজ্যিক সংস্থাদের
হ্যাঁ ওরা, আমার নদীমাতৃক ভূমি সহোদর কঙ্গোকে সদা সূর্যের নীচে
এক গোরস্থানে পরিণত করেছে।

৪.

হে প্রভু, আমার স্মৃতির সঞ্চয় থেকে সেই ফ্রান্সকে উঠিয়ে নাও
যা ফ্রান্সের সত্তার সঙ্গে এক নয়, যে ফ্রান্স ক্ষুদ্রতা এবং ঘৃণার মুখোশ
সেই মুখহীন মুখোশকে আমি ঘৃণা করি
হ্যাঁ, যা ঘৃণা এবং শয়তানের অংশ তা আমি ঘৃণা করতে বাধ্য।
কারণ আমার ফ্রান্সের জন্য মমতাবোধ আছে
হে প্রভু, আশীর্বাদ করো এই জাতিকে যারা পদানত ছিলো
এবং দুইবার যারা নিজের হাতের শৃঙ্খল মোচন করেছে
যারা রাজ্যপাটে দরিদ্রের স্থান নির্ণয় করেছে তাদের ক্ষমা করো

যারা দাসকে মানুষের মর্যাদা দিয়েছে—মুক্ত সমগোত্রীয় ভ্রাতৃত্বের
স্বাদ দিয়েছে
আশীর্বাদ করো সেই জাতিকে যারা আমার তোমার খবর এনে দিয়েছে,
হে প্রভু
যারা আমার নিদ্রাতুর চোখে তোমার বিশ্বাসের আলো এনে দিয়েছে
যারা আমার হৃদয় উন্মোচিত করেছে বিশ্বের জ্ঞান সংজ্ঞায়
যারা আমার রামধনুর মত নতুন সজীব মুখের ভাইদের দেখিয়েছে
হ্যাঁ ভ্রাতা-ভাই-সহোদর-সঙ্গী-আমি তোমাদের শুভেচ্ছা জানাই
তুমি মোহাম্মদ বিন আবদুল্লা, তুমি রাজাফিমাহাগ্রাতা, এবং তুমি
ফাশ-মান তুং, প্রশান্ত সাগর থেকে এবং মোহাচ্ছন্ন বনভূমির থেকে
তোমাদের সবাইকে আমি ক্যাথলিক উন্মুক্ত অসংকোচিত অভিবাদন
জানাই
হায় প্রভু, যদিও তোমার সেইসব ধর্মপ্রচারক আমার পুরোহিতদের
শিকারীর আগ্নেয়াস্ত্রে হত্যা করেছে যেন তারা ছিলো বনের পাখি মাত্র
আমি জানি ওরা আমাদের পবিত্র ধর্মমূর্তি পুড়িয়ে ছারখার করেছে
যদিও শান্তির মধ্যেই আমাদের মত বিনিময় হতে পারতো কারণ
আমরা একই আলোর পথিক!
সেই প্রতীক যা ছিলো ইয়াকুবের সিঁড়ি পৃথিবী থেকে যা ওঠে আলোর
ভুবনে তোমার স্বর্গে
শুদ্ধ পবিত্র ঘৃতে জ্বালা প্রদীপ তারা নিভিয়েছে যা রাত্রির গভীরে
আমাদের প্রভাতের ব্যঞ্জনা দিতো
সেই প্রভাত নক্ষত্র—যা সবিতার পূর্ব সংকেত।
তোমার ধর্মপ্রচারকদের অনেকেই হিংসার অস্ত্রে ধর্মের কথা বলছে
এবং বিত্তশালীদের অর্থের সাথে করেছে সখ্যতা।
কিন্তু আমি এও তো জানি সর্বত্রই সব সময় থাকবে বিশ্বাসঘাতক এবং
সবসময় থাকবে অজ্ঞান ঘাতক!

৫.

হা প্রভু! পরিত্রাণ দাও এই জাতিকে যারা মুখোশের নিচে নিজের মুখ
হাতড়ে কখনোই তা চিনতে পারে না—যারা তোমাকে খোঁজে
ঃ শীতে কুকড়ানো-ক্ষুধায় দুমড়ানো অস্ত্র এবং হাড়ে

দয়িতের জন্য বিলাপরত বিধবা এবং প্রতারিত তারুণ্যে
এবং স্ত্রীর কান্নায়, স্বামীর অনুপস্থিতিতে
এবং আবর্জনার ডাঁইএ যে মা তার শিশুর স্বপ্ন খুঁজতে যায়—
পরিত্রাণ দাও হে প্রভু এই জাতিকে যারা নিজেদের শৃঙ্খল মুক্ত করে
এই তীরভ্রষ্ট জাতিকে এই জাতি যারা অত্যাচারী এবং উদ্ধত প্রভু
তাঁদের সাথে ত্রাণ দাও সমস্ত ইউরোপের লোকদের, এশিয়ার জনমানুষের
আফ্রিকার এবং আমেরিকার——
সেই মানুষেরা যাদের স্বেদবিন্দুতে বেরিয়ে আসে রক্ত এবং দুঃখ
এবং চেয়ে দ্যাখো এই বিশাল মানবতার সমুদ্রে—কোটি কোটি ঢেউয়ের মধ্যে
আমার গোত্রের শির জেগে ওঠে--
তাদের উত্তপ্ত মুষ্টিতে জোর দাও যেন তারা পৃথিবী বলয়িত করতে পারে
ভ্রাতৃপ্রতিম আলিঙ্গনে
তোমার শান্তির রামধনুর নিচে
যেন পারে

দুই বালাফঙের জন্য

৭.

নিষ্ঠুর হাতে আমাকে তাড়িয়ে যায় সে নারীও সময় কুঞ্জে।
আমার কৃষ্ণ শোণিত লাফায়—লোকজন থেকে দূরে সে মাঠে
জ্যোৎস্নার রাত যেথা ঘুমন্ত।
হঠাৎ কখনো রাস্তা চলতে হোঁচটে ঘুরে
দেখি—সেই তালবীথি হাসিমাখা মৃদু বাতাসের ভারে
তার কথা স্বর পাখার মতন আদরে আমার মুখ ছুঁয়ে যায়
আর আমি বলি ঃ "হ্যাঁ, এত সিনারে!"

হ্যাঁ আমি দেখেছি সূর্য ডুবেছে নীলচোখে সে শুভ্র আফ্রিকানীর
সিপ্রেস ব্যাবিলোঁ অথবা বালাঙ্গরে মৃগনাভি আর গঙ্গো গন্ধে
তারই ঘ্রাণ এসে আমাকে স্পর্শ এবং শুধায়
গতকাল সেই এঞ্জেলুসের গীর্জার মোমবাতির দানে
তার দুই চোখ জ্বল জ্বল করে জ্বলছিলো, তার দেহত্বক উঠ্‌ছিলো জ্বলে
কাঁসার মতন মোমের আগুনে।

ঈশ্বর বলো, হে প্রভু আমার
আমার আদিম ইন্দ্রিয়ে কেন এ আগুন জ্বালো আর্তনাদের!
যেখানে আমার নৃত্য জাগে না, যেখানে আমার কন্ঠ দোলে না
তেমন মন্ত্র পড়বে জানি না, জানি না পড়তে সাদামাটা স্তব, প্রার্থনা-গাথা
কখনো মেঘপুঞ্জ কখনো প্রজাপতি আর বৃষ্টির ফোটা ক্লান্ত
আমার জানালার ধারে
সেই নারী শুধু ধাওয়া করে যায় বিশাল সময়ের প্রান্তরে
আমার কৃষ্ণ শোণিত লাফায়! ছুটায় আমায়!
তাড়ায় আমায়! নির্জন সেই রাত কন্দরে।

অনুবাদ: সুরাইয়া খানম

কৃষ্ণ সুন্দরী

নগ্ন নারী, কৃষ্ণ নারী
প'রে আছো যে-বসন সে তোমার ত্বকের লাবণ্য,
যা কিনা জীবন; পরিপূর্ণ অবয়বে তুমি হও
সুন্দরের প্রকৃত প্রতিমা!
আমি তো উঠেছি বেড়ে তোমার ছায়ায়;
সুখদ হাতের স্পর্শে হয়েছে আমার দৃষ্টি নমনীয়।
এবং এখন আমি এক সূর্য-ক্ষরা গিরিবর্ত্ম পার হ'য়ে
গ্রীষ্মের হৃদয় ছুঁয়ে, মধ্যাহ্ন পেরিয়ে এসে গেছি
তোমারই নিকটে হে আমার প্রিয় প্রতিশ্রুত ভূমি!
তোমার সৌন্দর্য যেন ঈগলের ডানার উদ্ভাস।

নগ্ন নারী, কৃষ্ণ নারী
পরিপক্ক শাঁসালো ফলের মতো, কালো মদিরার
বিষণ্ণ উল্লাস, আমার তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে গীতিময়
তোমার অত্যুষ্ণ ঠোঁট,
স্পষ্টতর দিগন্তের জন্যে বাড়ে নিধুয়া পাথার,
লিলুয়া বায়ুর নিচে শীৎকারে-আদরে
কেঁপে ওঠে নিষ্পাদপ বিশাল প্রান্তর;
বিজয়ীর আঙুলের নিচে বাজে বিভিন্ন ঢোলক;
তোমার ভিতরে গোপন মন্দ্রিত স্বর যেন কোনো
প্রেমিকের আত্মার সঙ্গীত!

নগ্ন নারী, কৃষ্ণ নারী
যে-তেলে মসৃণ শ্বাস, খেলোয়াড় স্বস্তি বোধ করে,
মালি-র সুকান্ত যুবরাজ পর্যন্ত আকৃষ্ট যেই উপাদানে;

মসৃণ ত্বকের রাতে নক্ষত্রের মতো জ্বলে মুক্তোগুলো
তোমার তনুর ;
আত্মার আনন্দ, ছড়াও সর্বদা তুমি চতুর্দিকে
জলপাই লাবণ্যে-ভরা সিক্ত ত্বকে গলিত সোনার মতো আলো,
তোমার চুলের স্নিগ্ধ ছায়ায়-ছায়ায়, চোখের আদরে
বেড়ে উঠি, আলোকিত হই——

নগ্ন নারী, কৃষ্ণ নারী
জীবনের শিকড়ের প্রয়োজনে নিয়তি তোমাকে
ভস্মীভূত করার আগেই
আমি গেয়ে যাই তোমার সৌন্দর্য-গাথা
এবং স্থাপন করি অবয়ব নিরবধি কালে॥

অনুবাদ : রফিক আজাদ

স্মরণে

রোববার।
আমাকে ভয়ার্ত করে স্বজনের ভীড়াক্রান্ত পাথরপ্রতিম মুখগুলো।
উঁচু এই কাচের মিনারে ব'সে মাথা ধরে ত্রাসে
আমার অস্থির পূর্ব-পুরুষের কথা মনে ক'রে—
আশাহত, দেখি : কুয়াশায় মোড়া টিলা ও আকাশ
স্তব্ধতায় ঢাকা, স্থির-------চিম্‌নিগুলো ভারী ও নিরেট।
এসবের নিচে প্রিয় স্বজনেরা মৃত, ধুলোয় মিশেছে সব——
আমার স্বপ্নেরা,
নিহতের রক্তে লাল হ'য়ে আছে এই পথগুলো,
ব্যবধান ঘুচে গেছে পথ আর কশাইখানায়,
এবং এখন এই মিনার-উচ্চতা থেকে কিংবা

শহরতলীর কোনো অমোঘ দূরত্ব থেকে দেখি
আমার অসংখ্য স্বপ্ন মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে পথের কিনারে,
অন্তিম শয্যায় যেন ঘুমিয়ে রয়েছে—
সীন নদীতীরে আর পাহাড়শ্রেণীর পদতলে;
গাম্বিয়া বা স্যালুমের তীরে যে-রকম
আমার মহান পূর্ব-পুরুষেরা ঘুমিয়ে আছেন।

মৃত স্বজনের প্রতি আমাকে ফেরাতে দাও মুখ।

অতীতে ছিলেন যাঁরা সন্ত, সমাধিগুলোতে আজ
ব'য়ে যায় সৌর সাল, কেউ নেই আর তাঁদের স্মরণ করে!
হে মৃত স্বজনবৃন্দ, সর্বদাই অস্বীকার করেছো মৃত্যুকে,
সাইনের তীর থেকে সীন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়ে
প্রাণপণে রুখেছো মৃত্যুকে যারা নিরবধি কাল,
নশ্বর আমার দেহে প্রবাহিত হে অপরাজেয় রক্তবিন্দু,
রক্ষা করো আমার স্বপ্নকে—একদা যেমন রক্ষা
করেছিলে তোমাদের প্রিয় পুত্রদের, সরু-উরু যাযাবরদের।
হে মৃত স্বজন, ভয়াল কুয়াশা থেকে আজ রক্ষা করো পারীর আকাশ,
যে-আকাশ প্রহরায় আছে মৃত প্রিয়জনদের।
আমাকেও রক্ষা করো মিনারের ভয়াবহ নিরাপত্তা থেকে,
যাতে ক'রে আমি নেমে যেতে পারি পথে
নীলচক্ষু, বীরবাহু আমার মহান ভাইদের কাছে॥

অনুবাদঃ রফিক আজাদ

নিউইয়র্ক

জাজ অর্কেস্ট্রা ঃ একক ট্রামপেট

নিউইয়র্ক, তোমার সৌন্দর্য আর দীঘল পায়ের
সোনালি বালিকা দেখে
বিভ্রান্তি হয়েছি আমি প্রথম ধাক্কায় ;

তোমার ধাতব চোখ, বরফের মতো শাদা হাসি
ভীষণ বিব্রত করে রেখেছে আমাকে ঃ
তোমার গগনচুম্বী অট্টালিকা আর রাস্তায় রাস্তায়
সূর্যের গ্রহণ দেখে
বেড়ে যায় মানুষের সমূহ উদ্বেগ,
চোখ তার হয়ে যায় পেঁচার মতন ;

গন্ধকের গন্ধযুক্ত তোমার আলোক
এবং গগনচুম্বী সীসাভ গম্বুজে
(যাদের ধারালো চূড়া আকাশকে বোবা করে রাখে)
ইস্পাতের পেশী আর পাথরের ত্বক—
এ নিয়ে ভ্রূকুটি হানো ঘূর্ণিঝড়ে, প্রাকৃতিক সমূহ দুর্যোগে।

ম্যানহাটানের এই পত্রহীন পথ-পাশে কেটে গেলো এক পক্ষকাল
------তৃতীয় সপ্তাহ অন্তে জাগুয়ার জ্বর এসে হানলো ছোবল
যেন স্পর্শমাত্র গিলে খাবে আমুণ্ডু আমাকে ;
এই এক পক্ষকাল ঝর্না দেখা হলো না আমার
এই এক পক্ষকাল তৃণভূমি দেখিনি কোথাও ;
কেবল দেখেছি পাখি, আকাশে উড্ডীন সব পাখি
সহসা ছিটকে পড়ে স্তূপীকৃত ভস্মের অতলে—

পাখিগুলো থুবড়ে পড়ে, পাখিগুলো মৃত।
তোমার মায়ের কোলে শিশুরা হাসে না, মায়ের মালঞ্চে, হায়, শিশুপুষ্প নেই।
নাইলনে আবৃত পা; পায়ে আর বুকে কোনো ঘাম নেই, ঘাম-গন্ধ নেই।
হার্দ্য উচ্চারণহীন এই সব মুখ, ঠোঁট নেই এই সব মুখে।
চালো টাকা, কিনে নাও কৃত্রিম হৃদয়--
এর চেয়ে মহত্তর প্রজ্ঞা নেই তোমার পুস্তকে।
শিল্পীর প্যালেট, দ্যাখো, স্বচ্ছোজ্জ্বল প্রবালে পুষ্পিত।

আর এই রাত্রিগুলো,--ম্যানহাটানের এই নিদ্রাহীন আগুনে রাতের
উষর প্রহর ফুঁড়ে বৈদ্যুতিক বিকট চীৎকার, আর
কালো জলে ভেসে যাচ্ছে স্বাস্থ্যানুগ প্রেম, যেমন বানের জলে
সারি সারি শিশুর শরীর।

২

গণনা-গুনতির যুগ,
নিউইয়র্ক, তুমি তো যাপন করো লতা আর গুল্মজাত স্বর্গ-চ্যুত সুখাদ্যের যুগ।
কান পাতো, একবার কান পেতে শোনো শুধু ঈশ্বরের খোল-করতাল,
শোনো—তোমারি রক্তের তালে বেজে চলে তোমার হৃদয়।
হার্লেমে শুনেছি আমি চাপা গুঞ্জরণ, দেখেছি পবিত্র বর্ণ, উজ্জ্বল সুবাস
...(ভেষজ-সম্ভার যারা তোমাকে যোগায়, এখন তাদের জন্য চায়ের বিরতি)
দেখেছি, দিনের শেষে প্রস্তুতি নিতেছে ওরা নৈশ উৎসবের।
দিনে নয়, আমি বলি এখানে সত্যের দেখা শুধু নিশীথেই।
আর সেই বিশুদ্ধ প্রহরে, যখন ঈশ্বর তাঁর স্মৃতিস্মর জীবনের সূচনা করেন,
উভচর প্রাণিবৃন্দ নেমে পড়ে প্রতিটি রাস্তায়,
তাদের শরীরগুলো অত্যুজ্জ্বল সূর্যের মতন।
হার্লেম, আহা, হার্লেম! আমিতো দেখেছি এই হার্লেমের রূপ!
তুঙ্গ স্তন আর রেশমের ঢেউতোলো নর্তকীর নগ্ন পায়ে
কর্ষিত এ পেভমেন্টে এখন ফলেছে, দ্যাখো, শস্য রাশি রাশি

এবং শস্যের রঙে সবুজাভ হয়ে ওঠে লিলুয়া বাতাস—
আহা, এই তো হয়েছে শুরু পদ্ম আর মুখোশের ব্যালে অপরূপ; আর
পুলিশী ঘোড়ার খুরে পিষ্ট হচ্ছে প্রেমের ফসল, যা কিনা গড়িয়ে পড়ে
নীচু নীচু গৃহ শ্রেণী থেকে।
দেখেছি রাস্তার পাশে শুভ্রবর্ণ মদের ফোয়ারা,
সিগ্রেটের ধোঁয়াশায় কৃষ্ণবর্ণ দুধের প্রবাহ।
দেখেছি বিকেল বেলা আকাশের বুক থেকে বৃষ্টির মতন ঝরে
সূতী ফুল, যাদু পুচ্ছ, দেবতার ডানা।
কান পাতো, হে নিউইয়র্ক কান পেতে শোনো বেহায়া পুরুষ কণ্ঠ
শানাইয়ের কাঁপা সুরে অশ্রু আর শোণিতের বোবা আর্তস্বর,
শোনো নৈশ হৃদয়ের অই দূরশ্রুত ধ্বনিপুঞ্জ,
ড্রামের শোণিত, ধ্বনি--ড্রাম আর ধ্বনি আর শোণিত প্রবাহ—

৩

নিউইয়র্ক, তোমার শোণিত-স্রোতে প্রবাহিত হোক আজ কাজল শোণিমা,
সমস্ত মরিচা আজ সাফ হোক ইস্পাতের গ্রন্থিলতা থেকে,
সেতুগুলো হয়ে যাক বাঁকানো পাহাড়—লতাগুল্মে আচ্ছাদিত সতেজ,
কোমল।
দ্যাখো, ওইতো আসছে ফিরে প্রাচীন সময়,
পুনরায় আবিষ্কৃত হচ্ছে, দ্যাখো, প্রাচীন একতা,
সিংহ আর ষাঁড় আর তরুদের মধ্যে, দ্যাখো, পুনরায় ঘটছে মিলন,
কর্মে ও আদর্শে আর শ্রুতি ও হৃদয়ে আর সংকেতে
ও বোধে, দ্যাখো, নতুন সংহতি।
তোমার নদীর জলে কুলুকুলু ধ্বনি,
কস্তুরী-সুবাস-যুক্ত অসংখ্য কুমীর,
মায়ামারীচের মতো চোখ-অলা শুশুকের পাল—
না, মৎস্যকন্যার খোঁজে কাজ নেই আর।

এপ্রিলের রঙধনু ওই তো আকাশে; অন্তত তাকাও ওদিকে; আর

যদি পারো খাড়া রেখো তোমার দু'কান—
তাহলে শুনতে পাবে সেক্সাফোনে ঈশ্বরের হাসি—
ইনিই ঈশ্বর, যিনি ছয় দিনে স্বর্গমর্ত্য বানাবার পরে
সপ্তম দিনের শেষে দিয়েছেন ঘুম, আহা, মহা নিগ্রো ঘুম।

অনুবাদ ঃ মুহম্মদ নূরুল হুদা

কঙ্গো

তিন কোরা ও এক বালাফঙের জন্য শোকগাথা

কঙ্গো! আমার কঙ্গো!
তোমার মহান নাম ছন্দিত করবো আমি
সাগরে, নদীতে আর আমার স্মরণযোগ্য সবার উপরে
(কিছুই রাখে না মনে লেখকের কালি)
তোমার মহান নামে প্রতিটি বীণার তারে তুলবো ঝংকার।

কঙ্গো! আমার কঙ্গো!
বনের বিছানা পেতে রয়েছো ঘুমিয়ে, রানী তুমি সারা আফ্রিকার
তোমার বিশ্বস্ত প্রজা সারি সারি পর্বতের শ্রেণী
তোমাকে রেখেছে ধরে অনেক উঁচুতে—
তোমার আসন পাতা সবার উপরে।
শপথ মাথার আর শপথ জিহ্বার আর শপথ পেটের
তুমি নারী, তুমি শুধু নারী—
তুমিই জননী জানি সে সব কিছুর, নাসারন্ধ্রে আছে যার শ্বাস
তুমিই জননী জানি জলহস্তী আর কুমীরের
তুমিই জননী জানি গিরগিটি আর শুশুকের
তুমিই জননী জানি পাখি ও মাছের

এবং জননী তুমি শস্যগ্রাসী বানের জলের।
মহিয়সী, তোমার জলের বুক দাঁড় ও ডিঙির জন্য নিত্য অবারিত
জলজ পদ্মের মতো দীর্ঘ আর শান্ত বাহু, মদমত্ত উরু নিয়ে
ছুটে আসে আমার প্রেমিক,
মহার্ঘ রমণী তুমি, তৈলাক্ত ওজুগু কাঠে তোমার শরীর,
হীরক-প্রতিম রাতে তনুর তনিমা।
সৌম্য দেবী, হাস্য-আভা বিচ্ছুরিত তোমার রক্তের ঘোর ঘূর্ণ্যমান
তরঙ্গ-চূড়ায়,
তোমাকে নামতে দেখে জ্বর-তপ্ত আমার শরীর; দেবী, আমাকে
উদ্ধার করো, রক্তের উত্থান থেকে আমাকে বাঁচাও।

চিতাবাঘ লাফ দেয়, পিপীলিকা ওৎ পাতে, তৃতীয় দিনের শেষে
পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে ঘৃণা, জলার অতলে বাড়ে আঁঠালো কর্দম,
শ্বেত মানুষের দল নরম ফেনিল গান গেয়ে যায় কোমল মাটিতে—
দেবী, আমাকে উদ্ধার করো, সমূহ সন্ত্রাস থেকে আমাকে বাঁচাও;
রক্ষা করো বনানীর নীরবতা, নিরানন্দ রাত্রি নয় আরাধ্য আমার।
আমি হবো তীক্ষ্ণ ছোরা, বাতাসে ছত্রিশ হাত উঠবো লাফিয়ে,
তোমার উদর জুড়ে নরম আবর্ত জুড়ে ভাসাবো আমার ডিঙি বিরামবিহীন।
সাফ করো তোমার বুকের সেই খুব গাঢ় প্রেম-দ্বীপ, হলুদ স্ফটিক আর
কস্তুরী-সুবাস-যুক্ত 'গঙ্গো'-র পাহাড়,
শৈশবের স্মৃতিসিক্ত জোআলের সমুদ্র-দালান, সেপ্টেম্বরে সুন্দরী দিলোর,
এর্মেনভিলে শরতের প্রশান্ত রজনী- - - - -চতুর্দিকে সুবাতাস যাক
বয়ে যাক।
মনে পড়ে তোমার চুলের শান্ত ফুলগুলি, তোমার মুখের শাদা দলগুলি,
সর্বোপরি, অমাবস্যার ভোজোৎসবে শোণিতের মধ্যরাত, আমাদের
প্রগাঢ় আলাপ;
দেবী, আমাকে উদ্ধার করো, রক্তের নিশীথ থেকে আমাকে বাঁচাও
নীরব বনানী-প্রান্তে ওই তো বসেছে আজ সতর্ক প্রহরা।

রয়েছে আমার পাশে আমার প্রেমিক, যার স্নিগ্ধ তৈল-স্পর্শে
কমনীয় হয়ে ওঠে হাত ও হৃদয়

যার ছন্দ-প্রেরণায় আমার প্রাজ্ঞতা ; জানি,
ত্যাগেই আমার শক্তি রয়েছে নিহিত, সমর্পণে আমার সম্মান।

উড়িয়ে পৌরুষ-ধ্বজা আসে সেই নৃত্যের নায়ক, খুব দ্রুত
প্রদর্শন করে যায় শৌর্যবীর্য তার, যেন সে গর্বিত এক শুশুক-শিকারী।
বাজাও বাজাও ঘণ্টা, জিহ্বাগুলি গানে গানে মুখরিত করো,
দাঁড়েও পড়ুক টান, নৃত্যের মোহন ছন্দে মেতে থাক মাঝির শরীর--
এ ডিঙি সুযোগ্য জানি ফেডীআউটের কীর্তিমান সব গায়কের---
দুহাতে দুবার ওরে বাজাও ঢোলক, এবং চল্লিশ জন কুমারীর মুখ
উচ্ছ্বসিত হোক তাঁর প্রশস্তি-গাথায়।

যে অনন্য ছন্দ-বেগে ছুটে চলে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ তীরগুলো,
মধ্যাহ্নের সূর্য-থাবা, কল্লোলিত প্রমত্ত জলধি, আর
সাফল্যের সহর্ষ চূড়ায় অনেক গভীর থেকে উঠে-আসা মৃত্যুর আহ্বান,—
তোমার ছন্দের কাছে ম্লান হোক সেই ছন্দ আজ।

ফেণার পদ্মের মাঝে এ ডিঙি উঠবে জেগে, জানি, পুনর্বার
শান্ত-স্নিগ্ধ বাঁশবন পার হয়ে এ ডিঙি ভাসাবো পুন
পৃথিবীর স্বচ্ছতোয়া স্ফটিক সকালে।

অনুবাদ ঃ মুহম্মদ নূরুল হুদা

মধ্যরাত্রির জন্য এলিজি

তোমার অমল আলোর দুগ্ধ পান করাচ্ছো তুমি
তোমার কবিকে, হে উজ্জ্বল খরার মৌসুম,
শস্যের মতোই আমি বেড়ে উঠেছিলাম বসন্তের দিনে
জলের হরিৎবর্ণ অন্তরঙ্গে মজ্জমান, আর
সময়ের সুবর্ণ থালায় আচ্ছন্ন ছিলাম আমি সবুজের মর্মরে।
আহা, সেই দিনগুলো আজ নাই! এই যে তোমার আলো
বইতে পারিনা আজ আর আমি, প্রদীপের সেই দীপ্তি
আমার সমগ্র সত্তা চূর্ণ করে দিয়েছিলো
তোমার শাস্তির মতো উজ্জ্বলতা;
আজ আমি বইতে পারিনা
আজ এই মধ্যরাত্রি, এই রাত্রির আলোক আমি বইতে পারিনা
এই দেখো সম্মানের জরির চটক
মনে হয় সাহারার উষরতা, কি বিপুল শূন্যতা
গুচ্ছ গুচ্ছ ঘাস নেই মরুদ্যান নেই
আঁখিপল্লবের সেই কম্পন আর
এই হৃদয়ের কোনো শিহরন নেই;
সারাদিনরাত দুটো চোখ খোলা, প্রসারিত হয়ে থাকে
দীক্ষাগুরু আমার পিতার মতো :
জোআলের পৌত্তলিক সরিসৃপের পূজারীরা
ক্রুশবিদ্ধ করে রাখে কঠিন পাথরে
পর্তুগীজদের সেই লাইটহাউস শুধু
আবর্তিত হয়ে ওঠে আমার দুচোখে, সারাদিন সারারাত
কিন্তু এই যান্ত্রিকতা সময়ের সর্বশেষ প্রহর পর্যন্ত
নিয়মেই থাকে বাঁধা, এবং নির্মম!

আমি এক ফাঁদে-পড়া চিতার মতন
আমার বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠি,
অকস্মাৎ এক সিমুমের ঝাপটা এসে
কন্ঠনালী চেপে ধরে,

আহা, আমি যদি রক্ত আর গোবরের মধ্যে এই শূন্যতায়
সেঁধিয়ে, কুঁকড়ে যেতে পারতাম!
আমার সেলফের বইগুলোর পাতায় পাতায় ইতস্তত হেঁটে চলি আমি
বইগুলো গম্ভীর দৃষ্টিতে
কেবল আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, নির্নিমেষ,
ছ হাজার প্রদীপের শিখা জ্বলছে এখানে
সারাদিন, সারারাত

আমি তো দাঁড়িয়ে আছি আশ্চর্যজনকভাবে স্পষ্ট
এবং দ্যাখো; কী সুন্দর আমি যেন একজন দৌড়বীর, যেন
আমি যৌন উত্তেজিত মৌরিতানিয়ার কালো এক ঘোড়া;
আর আমি বাইজান্টাইনের সমতলভূমি
কিংবা তার কঠিন পাহাড়গুলো উর্বর করবার জন্যে
রক্তের ভেতর থেকে ধুইয়ে দিয়েছি এক অসংখ্য বীজের নদী, নিঃসরণ,
তৈলাক্ত পিস্টন হাতে একজন প্রেমিক আমি, বাউণ্ডুলে আমি,
আমি জানি সেই মহিলার ওষ্ঠের স্বাদ রক্তিম ফলের মতো
পাথরের মতো ঘনসন্নিবিষ্ট ভাস্কর্যশরীর
সুপক্ব পীচের মতো তার রহস্যের মধু, আর তার সমস্ত শরীর
কালোশস্যবীজ বপনের জন্যে এইটুকু মৃত্তিকা!
এই স্বপ্নের ছাঁচের মধ্যে, এই খিলানের কোণে বসন্ত বসন্ত শুধু
এই যৌবন যেন এক এ্যান্টেনার মতো
যোগাযোগ করে দেয়, বিনিময় করে একমুঠো বার্তা।
ভালোবাসার এই সঙ্গীতে
কবিতার পবিত্র মোচড়ে
আজ আমি আর দেখতে পাইনা শান্তি,
সমস্ত অসঙ্গতি আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আজ

আমি শক্তি চাই, আমি শক্তি চাই প্রভু,
- - - - এই চাকু, চাকুর সমস্ত স্বাদ অনুশোচনার মতো
আমূল গ্রথিত হয়ে থাকে আমার হৃদয়ে,
আমি অবশ্যই মরবোনা।
যদি তা' নরক হয়, এই ঘুমহীনতা
একজন কবির বুকে এই ঊষরতা, জীবনযাপনের এই শ্রীযুক্তব্যথা
মুমূর্ষহীনতার এই মুমূর্ষতা, অন্ধকার চিরে চিরে এই দুঃসহ যন্ত্রণা
মৃত্যু কিংবা উজ্জ্বলতা ঘিরে যে আবেগ যে আবেগ
একঝাক মথ পতঙ্গের মতো
রাত্রিবেলা কুমারী অরণ্যের ভয়ঙ্কর গলিত আবর্জনায়
কোপনস্বভাবা আলেয়ার চারপাশে ঘোরে !

প্রভু, আলো আর অন্ধকারের হে প্রভু,
তুমি মহাজগতের প্রভু, আমাকে বিশ্রাম নিতে দাও
জন্মভূমি জোঅলের শ্যামল ছায়ায়,
স্বপ্নের মর্মরধ্বনি সোনালি শৈশবে তুমি
আর একবার আমাকে জন্মাতে দাও প্রভু,
আমার সেই মেষপালয়িত্রীর কাছে
আর একবার তুমি আমাকে মেষপালকের মতো করো,
আমাকে আবার তুমি টুকরো টুকরো করো
সমবেত সেই করতালির ভেতরে,

ড্রামের বাদ্যের তালে
আমাকে নাচতে দাও, আমাকে নাচতে দাও, প্রভু !
এসমস্ত শুধুই প্রার্থনা, তুমি জানো
তুমি জানো এই সহিষ্ণুতা কতটুকু ;
শান্তি আসবে, শান্তি আসবে,
প্রভাতের সেই উজ্জ্বল দূত সেই অসম্ভব পাখির কূজন
একদিন আসবে এখানে,

একদিন প্রভাত হবে, প্রভাতের উজ্জ্বলতা একদিন আসবে এখানে,
সেইদিন মৃত্যুর ঘুমের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকবো আমি একজন শ্রান্ত
কবি আমি,

প্রভাতের গহ্বরে ঘুমিয়ে থাকবো আমি,
আমার বাহুতে সবুজ---সোনালী--চোখ গেরুয়া পুতুল,
আর এই কথামালা, কী আশ্চর্য ভাষা
কবিতার অন্তর্গত ভাষা।

জোঅল

জোঅল,
তোমার কথা মনে পড়ে!

মনে পড়ে বারান্দার সবুজ আঁধারের সেই অঙ্কশায়িনীদের—
ম্যুলাটো রমণী,

যাদের চোখগুলো
পরাবাস্তব আভা হয়ে থাকতো
যেন সমুদ্র সৈকতে চন্দ্রালোক,
মনে পড়ে সূর্যাস্তের বর্ণাঢ্য সমারোহ
যাকে দয়ুফরাজা করতে চেয়েছিলেন তাঁর রাজভূষণ,
মনে পড়ে সেই শেষকৃত্যের ভোজ
জবাই করা গাভীদের রক্তে বাষ্পায়িত,
সেই কলহের শব্দ মনে পড়ে, আর সেই পোষ্য গায়কদের স্তব;
মনে পড়ে সেই পৌত্তলিক গীতিসমূহের ধ্বনি
মিছিলসমূহ আর সেই তালগাছগুলো;
মনে পড়ে সুসজ্জিত তোরণগুলোকে;

মনে পড়ে সেই মেয়েদের নৃত্য
যারা বিবাহ করতে চায়,
মল্লযুদ্ধে, চীৎকার সমস্বর-----
আহা সেই তরুণদের নৃত্যের শরীর, সম্মুখে উন্মুখ, কৃশ,
অবিমিশ্রি ভালোবাসা উচ্চারিত হয়েছিলো কতো মহিলার ঃ
'----হে আমার প্রিয় রক্ষক!'
মনে পড়ে, মনে পড়ে যায় ----
এখন আমার স্নায়ুর ভেতরে একটানা শুধু
রোগার্ত গানের সুর—পশ্চিমের স্মৃতিবাহী,
যখন তখন শুধু আসে আর যায়
উন্মুল জাজের ধ্বনি
কেবল রোদন করে, কেবল রোদন করে, রোদন----

টোটেম

আমি ঠিকই লুকিয়ে রাখবো
ঝঞ্ঝাকালো গাত্রবর্ণের পূর্বপুরুষদিগকে
ওই ধমনীর অন্তরঙ্গ গভীরতায়,
বজ্র আর বিদ্যুতে বিদ্ধ—
এবং আমার রক্ষাকারী সেই পশুটিকে
আমি ঠিকই লুকিয়ে রাখবো তাকে,
যাতে কলঙ্কের ব্যূহকে ডিঙোবার বিস্ফোরণ হয়ে
মুক্ত হতে না পারি কোনোদিন, আমি।
সেইতো আমার বিশ্বস্ত রক্ত
যে আমার আনুগত্য চেয়ে থাকে
যে আমার নগ্ন অহংকার রক্ষা করে,
আমার এবং
শৌর্যবান জাতিসমূহের ঔদ্ধত্যের হাত থেকে।

অনুবাদ ঃ জাহিদুল হক

পরিশিষ্ট

লিওপোল্ড সেদার সেঙ্ঘর : তাঁর ভাব-জগৎ

শামসুজ্জামান খান

এক

শিশুকালের উদ্দামতা ও গভীর ভালবাসায় আফ্রিকাকে বুকের গভীরে ধারণ করেছিলেন লিওপোল্ড সেদার সেঙ্ঘর। ফরাসী আফ্রিকার শ্বেতকায় স্কুল বা ক্যাথলিক মিশনের শিক্ষাজীবন তাঁর উপর ফরাসী জীবন ধারাকে শুধু বাহ্যিকভাবেই চাপিয়েছিল মাত্র। তবে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যিকে পরম মমতা ও যত্নে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে কবিতা লিখেছেন ওই বিদেশী ভাষায়।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ফরাসী দেশে তাঁর প্রবাস জীবন প্রধানতঃ ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতেই নিয়োজিত। ১৯৩৪-এ সরবোন থেকে *Licence-es-Letters* ডিগ্রী লাভ। এম.এ-র সমমানের পরীক্ষায় তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল : 'Exoticism in Baudelaire'. পরবর্তী-কালে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ফরাসী ভাষা পড়াবার জন্য জটিল ও প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষায় (*agregation*) অংশ গ্রহণ। এ পরীক্ষার জন্য তাঁকে ফরাসী নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে হয়। এগ্রিগেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম আফ্রিকান তিনিই। এই কৃতিত্ব তাঁর বাল্যকালের শিক্ষক হবার স্বপ্নকে সফল করে তোলে। শিক্ষকতার জীবন প্রধানতঃ ১৯৩৫-৪০। কৃতিত্বপূর্ণ শিক্ষাজীবনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা একটা স্পষ্ট রূপ নিতে থাকে। অন্যদিকে সমৃদ্ধ ফরাসী সাহিত্যের গভীর পাঠ ও ফরাসী সাহিত্যিকদের সাহচর্য তাঁর কবি-সত্তাকে সজাগ ও প্রকাশমান করে তোলে।

এ সময়েই লিখিত হয় তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ *chants d' Ombre*-এর কবিতা সমূহ। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত 'নির্বাসনের এই কবিতা'র ('poetry

of Exile') মাধ্যমেই তিনি তাঁর শিশু-রাজ্যের কথা বলেছেন। এ শিশু-রাজ্যের স্মৃতিতে আফ্রিকা তার সরলতা ও সমৃদ্ধিতে কবির মনে সজীব ও নিষ্পাপ রূপে রয়েছে। কারণ এই শিশু-রাজ্য (Kingdom of Childhood)-তথা অকৃত্রিম আফ্রিকা (Kingdom of Africa) হল, "....a world 'innocent of Europe,' a world into which Europe has not yet intruded. .....But besides all these, the Kingdom of Childhood is a state of mind, almost a state of grace, the realm not of the supernatural, but what Senghor calls the surreal, and which he belives can be reached by the power of poetry..... This poetry is then a pastoral poetry, a poetry concerned with the lost paradise of Childhood which is also the lost Paradise of Africa."

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে সেঙ্ঘর ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ফরাসীরা জার্মানদের কাছে পরাজিত হওয়ায় তিনি যুদ্ধ-বন্দীর জীবন যাপন করতে থাকেন। ১৯৪০-৪২ সাল পর্যন্ত তাঁকে বিভিন্ন ক্যাম্পে রাখা হয়। ক্যাম্প জীবনের দিনগুলোতেই রচিত হয় তাঁর কিছু অসামান্য কবিতা। এ কবিতাগুলোকে নিয়েই ১৯৪৮-এ বের হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, *Hosties Noires* (Black victims). এ কাব্যগ্রন্থে দেশকে শিশুকালের স্মৃতিময় স্বপ্ন দিয়ে তিনি দেখেননি। যুদ্ধ ও বন্দী জীবন তাঁর জীবন চেতনায় এনেছিল একটা বড় রকমের পরিবর্তন। বন্দী জীবন থেকে মুক্তিলাভের পর সেঙ্ঘর পুনরায় শিক্ষকতার জীবনে ফিরে যান। এ পর্যায়ে তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ বের হয় আফ্রিকার ভাষা ও কাব্য-রীতি সম্পর্কে। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন।

ফরাসী আফ্রিকা ও বর্তমান স্বাধীন সেনিগালের রাজনীতির বহু জটিল, অস্বস্তিকর ধাপ অতিক্রম করে তিনি এখন তাঁর দেশের রাষ্ট্রপতির গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে কাব্য চর্চাও চলেছে সমান্তরাল ভাবে। ১৯৫০ সালে বেরিয়েছে তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *Chants pour Naett*, ১৯৫৬ সালে *Ethniopiques* এবং ১৯৬১-তে *Nocturnes*. তাঁর গদ্যরচনার সংখ্যাও অসংখ্য ও বিচিত্রধর্মী। রাজনৈতিক সমস্যার মুখোমুখী

হয়ে তিনি যেমন ভাষণ, বিবৃতি, প্রবন্ধ রচনা করেছেন তেমনি আফ্রিকার ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, কবিতা, গান, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়েও নিরলসভাবে লিখেছেন চমৎকার ফরাসী গদ্যে। ইংরেজী অনুবাদেও তাঁর বেগবান ও লালিত্যময় গদ্যের স্বাদ পাওয়া যায়। চিন্তার ঋজুতা ও মৌলিকতা তাঁর গদ্য রচনার অন্যতম প্রধান গুণ।

দুই

"আমি ভালবাসি
আমি ভালবাসি
সূর্যের উপর ধাবমান
নিখিল আফ্রিকাকে"

সেনিগালের কবি আসাদ মুস্তফা ওয়াদ-এর এই কবিতাংশ তথাকথিত 'ঘুমন্ত আফ্রিকার', চলমান ও সচল রূপকে বিদ্যুৎ চমকের মত আমাদের সামনে এনেছে। এই চেতনার আর একটা দিক ফুটেছে মোজাম্বিকের কবি মার্সেলিনো ডস সান্টোসের কবিতায়:

"এখন থেকে
খনিতে খনিতে
একটা ইচ্ছা
অঙ্কুর মেলে দিক—
স্বাধীনতা।"

আফ্রিকার প্রায় সকল কবির রচনাতেই এই জঙ্গম ও নতুন জন-জাগরণের কোলাহল ও স্বাধীনতার আর্তি প্রকাশিত। নতুন আফ্রিকার জীবন ও স্বপ্নকে রূপায়িত করতে গিয়ে আফ্রিকার কবিরা জাগ্রত নিগ্রোর অনুভূতি-মালাকে স্তবকে স্তবকে সাজিয়েছেন তাঁদের কবিতায়। আফ্রিকার আদিম জীবন ও বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অংশ চয়ন করে এর প্রাণশক্তি ও ধারাবাহিকতাকে যুক্ত করেছেন বিশ্ব-সংস্কৃতির সঙ্গে। এই সূত্রেই এসেছে 'আফ্রিকীয়তা' (Africanity) ও 'নিগ্রোত্বার' (Negritude) তত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদ কর্তৃক কালো আফ্রিকার মানুষকে ঘৃণা, অবহেলা ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কাব্য আন্দোলন। এ

আন্দোলনের সূচনা ফরাসী প্রবাসী আফ্রিকার কবিকুলের রচনায়। এসব কবিতা ফরাসী ভাষায় লেখা হলেও বিষয়বস্তু ও জীবনবোধে তা আফ্রিকীয় বা নিগ্রো। কবিরা সামাজিক ও রাজনৈতিক চৈতন্যে স্থিত থেকে আফ্রিকী জীবন চেতনাকে দীপ্র ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন। ফরাসী কবিতার প্রকরণ ও বিন্যাসকে মেনেও মূল জোর দেওয়া হয়েছিল বক্তব্য ও বিষয়ের উপর। এ বিষয়টিকে লক্ষ্য করেই জাঁ পল সার্ত্র ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সেংঘর সম্পাদিত ফরাসী আফ্রিকার কবিতা সংকলনের ভূমিকায় বলেছিলেন, এ কবিতা হল: 'True revolutionary at our time ..... the voice at a particular historical moment." আফ্রিকার তৎকালীন নতুন কবিতা সম্পর্কে আরো স্পষ্ট মন্তব্য করেছিলেন জার্মান সমালোচক জোহেঞ্জ জন (Jonheinz John)। তিনি খুব সঠিকভাবেই বলেন: "In African Poetry the expression is always in the service of the content ; it is never a question of expressing oneself, but of expressing something."

'আফ্রিকীয়তা' বা 'নিগ্রোতা' আন্দোলনের পটভূমিকা ব্যাখ্যা করে দুজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন: "The Problem was what their attitude should be towards themselves—Africans, or men of African descent—who not only had to deal with the French colonial Policy of assimilation, but had been formed by it themselves. The French had made them Frenchmen before they were aware they were Africans." (Introduction: Leopold Sedar Senghor : Prose and Poetry, selected and Translated by John Reed and clive wake. Oxford University Press, P.8, 1965).

এই এসিমিলেশনকে সেংঘর ও তাঁর সমকালীন আফ্রিকী বুদ্ধিজীবিরা মেনে নিতে পারেননি। সেংঘর বলেছিলেন আমরা ফরাসী সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে 'এসিমিলেট' করতে রাজী আছি কিন্তু 'এসিমিলেটেড' হতে নয়। কারণ আফ্রিকার এমন কিছু আছে যা অন্যের নেই এবং আমরা অন্যের সভ্যতায়ও কিছুটা অবদান রাখতে পারি। এ বক্তব্য শুধু সেংঘরের একার নয় বা নিগ্রোতার তাত্ত্বিকদেরই নয়—প্রায় সকল প্রধান আফ্রিকান লেখকেরই।

নাইজেরিয়ার বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক চিনুয়া আচিবে বলেছেন: "শ্বেত-কায়দের আগমনের পূর্বে আফ্রিকা শূন্যতায় ছিলো না। শ্বেতকায়রা আফ্রিকায় সভ্যতা-সংস্কৃতি আমদানী করেছেন বলে যে গর্বিত উক্তি করে থাকেন তা মিথ্যাচার মাত্র। কারণ তাদের আগমনের পূর্বে আফ্রিকায় সমৃদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব বর্তমান ছিলো'।

আফ্রিকীয়তা কথাটির আগে 'নিগ্রোতা'র ধারণাই প্রথমে রূপলাভ করতে থাকে। কারণ ১৯৩০-এর দশকে ফরাসী দেশে আফ্রিকার চেয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কালো মানুষেরাই অধিক সংখ্যায় বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি-কর্মী হিসাবে সংগঠিত হয়ে উঠেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের চেতনা ছিলো নিগ্রোতার চেতনা, আফ্রিকীয়তা নয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ফরাসী প্রবাসী কবি ও সেঙ্ঘরের বন্ধু এইমে সেজারের কবিতায় এই নিগ্রোতার তত্ত্ব রূপায়িত হয়ে উঠে। কবিতার মাধ্যমে এ আন্দোলন গড়ে উঠবার আগে ফরাসী গায়েনার কবি লিওন ডামাস নির্বাসিত নিগ্রোদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করেন এবং তারই সমর্থনে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। এতে যা বলা হয় তার ইংরেজী ভাষ্য এরকম:

"My hatred thrived on the margin of culture
The margin of theories and the margin of idle talk
With which they stuffed me since birth
Even though all in me aspired to be Negro
While they ransack my Africa." (Points of view in
African Poetry: Ashis Sanyal: Lotus, No 24-25/75,
p, 31 এ উদ্ধৃত।)

ফরাসী পুলিশ ঘোষণাপত্রটি নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু দু বছর পর সেজার ডামাস-এর সূত্র থেকে নিগ্রো কাব্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হন সেনিগালের কবি সেঙ্ঘর, বিরাগো ডিয়োপ, ডেভিড ডিয়োপ এবং অন্যান্য আফ্রিকীয় কবি। তবে পরবর্তীকালে আফ্রিকীয়তা ও নিগ্রোতা' আন্দোলনের তাত্ত্বিক হিসাবে সেঙ্ঘরের নামই বিশ্বব্যাপী প্রচার লাভ করে। তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব এর পেছনে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিলো। তা ছাড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক লেখার মাধ্যমে এসব তত্ত্বকে

তিনি একটি দার্শনিক ভিত্তিও দিয়েছেন। আফ্রিকার কোন কোন রাজনৈতিক তাত্ত্বিক অবশ্য এর সমালোচনাও করেছেন। ঘানার রাজনীতিবিদ আলেক্স কোয়েশন সেকেই বলেছেন : "Why should the colour of a man's skin mean anything ? what is truly important is the self-respect and mutual understanding among all human beings of whatever "colour.' — Africa unbound : Alex Quaison-sackey, London 1963, P-161). সার্ত্র একে বলেছিলেন "antiracist racism. 'নিগ্রোতাকে' কেউ কেউ বর্ণবাদ বলে সমালোচনা করায় সেঙ্ঘর বলেছিলেন: "It is not racialism, it is culture." একে আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রামের একটি উপাদান হিসাবে বিবেচনা করে তিনি লিখেছেন, এ হল : …the restoration and assertion, the protection and expression of the identity of the black Nations. i.e as Negritude. তিনি একে ব্যাখ্যা করে আরো বলেন : "আফ্রিকীয়তা হচ্ছে একটি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধপুঞ্জ যার একটা দিক নিগ্রোতা, আরেকটি আরববাদ এবং উত্তর আফ্রিকার আদিবাসীবাদ।" ...."নিগ্রোতা কথাটার সরল অর্থ হচ্ছে কালো মানুষের জগতের সমগ্র সাংস্কৃতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ। যে কথাটার উপর বিশেষ জোর দেওয়া দরকার এবং আমি বর্তমানে আমার রাজনৈতিক গবেষণামূলক নিবন্ধ "আফ্রিকার সভ্যতা'য়ও যার উপর জোর দিয়েছি সেটা হচ্ছে এই যে, আমরা শুধুমাত্র উর্বর, ফলপ্রসূ মূল্যবোধ-গুলিকেই বাঁচিয়ে রাখতে চাই। এই মূল্যবোধগুলো হচ্ছে ঠিক সেগুলোই যা নিগ্রো বা আফ্রিকীয় যথা : (ক) একাত্মতা সঞ্চারের বোধ, (খ) প্রতীকের বোধ (গ) রূপবোধ এবং (ঘ) ছন্দবোধ।

নিগ্রোতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কোন মতেই স্থাণু নয়, এ ধারণা জঙ্গম। 'নিগ্রোতা' কি কিছুটা বর্ণবাদী ? না, তা কিছুতেই নয়। তবে সমস্ত বর্ণের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতার শর্তমূলক ভিত্তি আমাদের নিগ্রোতায় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হওয়া। প্রথমে এক এক জনকে একটা সত্তার অধিকারী হতে হবে। সংযোজনাকে সম্ভব করার জন্য একটা বিষয়-সত্তা স্থির করতে হবে, যাতে প্রগতি হবে সংযোজন। এই বিষয় সত্তাকে হতে হবে প্রাণবন্ত। আসুন, আমরা কালো রক্তের মর্মর ধ্বনি শুনি, আফ্রিকার বিস্মৃত গ্রামদেশের

গভীর ধমনী স্পন্দন শুনি" (দ্রঃ 'আফ্রিকা মহাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও সাহিত্য': রণেশ দাশগুপ্ত, গণসাহিত্য' ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫)।

পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন: "Negritude, then, is a part of Africanity. It is made of human warmth. It is democracy quickened by the sense of Communion and brotherhood between men. More deeply, in work of art, which are a people's most authentic expression of itself, it is sense of image and rhythm, sense of symbol and beauty. ('The Struggle for Negritude').

আফিকার রাজনৈতিক সমস্যা জটিল। এই জটিল সমস্যার মুখ খুলে যাঁরা আফ্রিকাকে সামনে এগিয়ে নেবার সাধনায় রত সেঙ্ঘর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আফ্রিকার প্রতিটি জাতি-রাষ্ট্রের স্বকীয় বিকাশের মাধ্যমে সমগ্র আফ্রিকার ঐক্যকে সম্ভব করে তোলার জন্যই সেঙ্ঘর প্রথমে 'নিগ্রোতা' ও পরে 'আফ্রিকীয়তার' তত্ত্ব দাখিল করেছেন। আফ্রিকার এই সমগ্রতাকে বিশ্ব সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত করেই তিনি প্রথম পূর্ণাঙ্গ মানব সংস্কৃতি গড়ে তোলার পক্ষপাতী। পূর্ণাঙ্গ বিশ্বসংস্কৃতিতে আফ্রিকার অংশটুকুকে তিনি চিহ্নিত করতে চান 'নিগ্রোতা'র অভিধায়। কারণ তার মতে:

"Negritude is the awareness, defence and development of African cultural values."

তিন

"Look here my friend, it is dawn. Look at our face and find that a new morn has dawn over old Africa"

—Patrice Lumumba

বাংলাদেশের সঙ্গে একটি ক্ষেত্রে আফ্রিকার অনেকটা মিল লক্ষ্য করা যায়। দুই দেশেই রাজনীতি ও সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে চলে। আফ্রিকার ক্ষেত্রে অবশ্য ওই সম্পর্ক আরো বেশী সুস্পষ্ট, গাঢ় ও লক্ষ্য-ভেদী। কারণটি স্পষ্ট। সারা আফ্রিকা জুড়ে চলছে নবউত্থান। গত পঞ্চাশ বছর ধরে আফ্রিকার কবিরা এই উত্থানের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন আর রাজনীতিবিদরাও নিজেদের টেনে এনেছেন কবিতার ভুবনে। আফ্রিকাকে

বুঝবার, নতুন করে আবিষ্কার করার, এর হৃদয়ের গভীর ক্ষতে হাত রাখার এবং এর বঞ্চিত-লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত জনগোষ্ঠীর বেদনাকে ভাষা দান করার এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে কবিতা। কঙ্গোর শহীদ রাজনীতিবিদ ও কবি লুমুম্বা, মোজাম্বিকের মার্সেলিনো ডস সানেটাস, সেনিগালের সেঙ্ঘর, গিনির আহমেদ সেকুতুরে, এঙ্গোলার অগাষ্টিনো নেটো, সুদানের শহীদ কবি মোহাম্মদ মগুব এমনি আরো কত কবির রচনা যুক্ত হয়ে আফ্রিকার কবিতা হয়ে উঠেছে রক্তিম ও বর্ণময়। তানজানিয়ার রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস নায়ারেরে নিজে কবিতা হয়তো লেখেননি কিন্তু মাতৃভাষা সোয়াহিলীতে তাঁর অসাধারণ দখলের প্রমাণ রেখেছেন যত্ন ও নিষ্ঠায় শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার ও কিং লিয়ার অনুবাদ করে।

মুক্তিসংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে এনে যাঁরা কবিতাকে স্থাপন করলেন তাঁদের মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মার্তিনিক দ্বীপের কবি এইমে সেজার এবং সেনিগালের সেঙ্ঘর প্রমুখের ভূমিকা অগ্রচারীর। সেজার বিন্যাস ও প্রকরণে সুররিয়া-লিষ্ট এবং কিছুটা জটিল, বিষয়ের দিক থেকে 'ভায়োলেন্ট' এবং আফ্রিকান। সেঙ্ঘর তাঁর মূল্যায়নে বলেছেন "সেজার কবি হিসাবে খুবই বড় কিন্তু ইউরোপের সুররিয়ালিজম প্রভাবিত ভাবধারা সেজারের কবিতার প্রধান গুণ নয় বরং জীবনের প্রতি নিগ্রোতার দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্দাম ছন্দময়তাতেই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য বিধৃত।" সেঙ্ঘরের মূল প্রবণতাও তাই। শৈশবের স্মৃতিতে ধরে রাখা আফ্রিকার বৈভব ও উদ্দাম প্রাণময়তা উঠে আসে তাঁর কবিতায়। সেই উজ্জ্বল অতীতকে হারানোর বেদনার সঙ্গে যুক্ত হয় ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা। তাঁর বহু কবিতায় নানা ভাব ও ভঙ্গিতে এই ক্ষোভ ও ঘৃণা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থে এ চেতনা প্রবল। "প্যারীতে তুষার পাত" কবিতায় তিনি লেখেন :

"কিন্তু আমার হৃদয় সূর্যের আগুনে তুষারের মত গলে গেল
এবং আমিও ভুলে গেলাম।
সেই সব সাদা হাতেরা যারা বন্দুক টৌটাপুরে
তোমার সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল।
সেই সব হাতেরা
যারা ক্রীতদাসকে মেরেছিল চাবুক
এবং তোমাকেও,

সেই সব ধূলোপড়া হাতেরা আমাকে থাপ্পর মেরেছিল,
সেই সব হাতেরা,
যারা আকাশ স্পর্শ করা বনের
পদানত আফ্রিকাকে করেছিল নির্মূল।"

এ ধরনের ক্ষোভ আছে সেঙ্ঘরের কবিতায়। তবে তাঁর কবিতার সুর সর্বত্র চড়া নয়, কখনো তিক্ততার একটু প্রলেপ, কখনো অন্ধকার বিদীর্ণকারী বজ্রের মত একটা চমক, কখনো বা ক্ষোভ-বেদনা আর অবহেলা-নির্যাতনের জ্বালার আবহের ভেতর থেকে ফুটে উঠা সংহত, নিটোল পংক্তিমালা। আবেগের তীব্রতা, ধ্বনিময়তা, সুরলালিত্য ও অনুপ্রাসের ঝঙ্কার, আফ্রিকার আদিম নাচের ছন্দ ও দোলা, স্বকীয় প্রতীক ও চিত্রকল্পের বহুলতা তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট করেছে। এক হাত রাজনীতিতে এবং অন্য হাত কবিতার মধ্যে রেখেও একরৈখিকতা বর্জনের প্রচণ্ড ক্ষমতা শুধু খাঁটি কবিরই থাকার কথা। সেঙ্ঘর সেদিক থেকে মূলতঃই একজন খাঁটি ও পরিশীলিত কবি। কিন্তু তাঁর সব চিন্তাভাবনার মূলেই আছে অতীত আফ্রিকার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও গৌরব-গাঁথার পুনরুদ্ধার চেতনা। এদিক থেকেই "নিগ্রো কবিরা কালো অর্ফিয়ুস"—সার্ত্রের এ অভিধা সেঙ্ঘরের ক্ষেত্রে বিশেষভাবেই প্রযোজ্য।

আফ্রিকার নতুন কবিতা মুক্তি সংগ্রামের একেবারে ভেতর থেকে উঠে এলেও এ কবিতা একমাত্রিক নয়, নিরক্ততো নয়ই—এর রয়েছে নানা বৈচিত্র্য ও দীর্ঘমাত্রা, বিচিত্র স্বাদ ও গভীর ব্যঞ্জনা। ১৯৬০-এর দশক থেকে এসব প্রবণতা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জীবনের raw Texture নিয়ে কাজ করলেও এ কবিতা Profound, পরিশীলিত এবং মেচিউরড্ হয়ে উঠছে। কিন্তু এর বিকাশ ধারা artificially Sophisticated নয়। তবে লোক-সঙ্গীত ও আদিমতার বৃন্তে প্রস্ফুটিত হলেও বিন্যাস ও পরিচর্যায় আধুনিক।

ফরাসী ও ইংরেজী কবিতার সংস্পর্শে এসে আধুনিক আফ্রিকার কবিতা জাতীয় সত্তাকে তীক্ষ্ণ রেখেও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। আফ্রিকার নিজস্ব ধ্যানধারণা, লোকসুর, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, পাশ্চাত্ত্যের ব্যক্তিকতার চেতনা বা আধুনিক কোন বিশ্বভাবনা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে একালের কবিতায়। কয়েকটি উদাহরণ:

সেনিগালের কবি বিরাগো ডিয়োপের 'প্রশ্বাসেরা' কবিতা:

ক. "যারা মৃত তারা কিন্তু কোন দিনই বিগত নয়
তারা রয়ে গেছে আলোকিত হয়ে উঠা গাছের ছায়ায়
অন্ধকার-ঘন বৃক্ষছায়ে।
মৃত যারা শুয়ে আছে মাটির তলায় তারা
বিগত নয়।
তারা রয়ে গেছে ঐ কাঁপন লাগা গাছে
ঐ কাঁদুনে কাননে
ঐ স্রোতস্বিনী ঝর্ণায় ঝর্ণায়
তারা রয়ে গেছে ঐ উত্তাল সাগরে
তারা রয়ে গেছে ঝুপড়িতে ঝুপড়িতে
রয়ে গেছে লোক সমাবেশে
মৃত যারা তারা মৃত নয়।"

দক্ষিণ আফ্রিকার কবি কুনিনি লেখেন :

খ. So many are asleep under the ground,
When we dance at the festival
Embracing the Earth with our feet
May be the place on which we stand
Is where they also stood with their
dreams.

মাদাগাস্কারের ফরাসী ভাষী কবি ফ্লাভিয়েন রানাইভো-র কবিতা :

গ. "লাউ খোলাতে রেখেছি জল সখি,
থাকবে ভরা যেমন ভরে রাখি;
তেমন করে আমায় ভরে রেখো
গীটার তারে, প্রতিটি ঘাটে ঘাটে
শুধুই তুমি তোমার ভালবাসা।"

কেপ ভার্দের কারারুদ্ধ কবি আন্তোনিও জাসিন্তো তাঁর "ভালবাসার কবিতা"য় লেখেন :

ঘ. "প্রিয়তমে
আজ যে সূর্যালোক থেকে আমি বঞ্চিত
তাতে আবার যখন রাখবো চোখ

তখন আমরা শান্তিতে সজ্জিত হয়ে
হাতে হাত রেখে চলবো
প্রাণবন্ত আঁকাবাঁকা পথে
তারায় তারায় ছাওয়া পাহাড়ের গা বেয়ে
আমাদের হাসি দিয়ে ফুল আর ফলের গুচ্ছকে
বেঁধে বেঁধে চলবো গাইব গান
সেই গান যা শিখেছি এত দিনে
যা এখনো শিখবার বাকী।"

আফ্রিকান সত্তার অন্বেষায় আইভরী কোষ্টের কবি বার্ণার্ড ড্যাডি নিজেকে তুলে ধরেন এভাবে :

ঙ. 'I thank you God for creating me black,
for making of me
Porters of all sorrows,
Setting on my heart
The world.
White is the colour for Special occasions
Black the colour for every day
And I have carried the world since the
First evening'

এইমে সেজারের সেই অসাধারণ কবিতা : "নিজের দেশে ফিবে আসা" :

চ. "আমারই নাম বোর্দো নানতেস আর লিভারপুল আর নিউইয়র্ক
আর সান ফ্রানসিসকো

পৃথিবীর সমস্ত কোণে কোণে আমারই বুড়ো আঙুলের ছাপ
আর আমার গোড়ালীর চিহ্নে ভরা সমস্ত আকাশ ছোঁয়া বাড়ি আর
আমার মল
মণিমাণিক্যের ঝলকানিতে!
আমার চেয়ে বেশি গর্ব করতে পারে কে?
ভার্জিনিয়া। টেনেসি। জর্জিয়া। আলাবামা।
শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া সব বিদ্রোহের
ভয়াবহ পত্তন

রক্তের গলিত জলাজমি
থমকে-যাওয়া জয়ধ্বনির পরিহাস
লালপৃথিবী রক্ত পৃথিবী ভাই পৃথিবী।"

সুররিয়ালিজমের প্রকরণের সঙ্গে আদিম আফ্রিকার ইতিহাস, কিংবদন্তী আর ট্রাজেডি তুলে এনেছেন দামা, "যে রাতে তারা এল" কবিতায়

ছ. "তারা সে রাতে এসেছিল, যখন
টস
টম
ভেসে চলেছিল
ছন্দ থেকে ছন্দে
উন্মাদনা
চোখ
উন্মাদনা হাত উন্মাদনা
মূর্তির পা
সেদিন থেকে
আমাদের মধ্যে কতজন
মৃত
সেই রাতের পর থেকে
যখন তারা এসেছিল
টস
টম
ভেসে চলেছিল
ছন্দ থেকে ছন্দে
উন্মাদনা
চোখ
উন্মাদনা হাত উন্মাদনা
মূর্তির পা।"

কঙ্গোর কবি চিকায়া উতামযির কবিতা :

জ. "পরিপাটি করে তৈরী পণ্যের এই পুঁজের মধ্যে
আমার উত্তম জগতকে দেখার জন্যে

আমি আমার অক্ষিগোলকে গোলকে
খাঁজ করে বসিয়ে দি
কমলাফুলের পাঁপড়িগুলোকে
ওরা যেন দাউ দাউ করে জলা আগুন না হয়ে উঠে
ওরা যেন শ্বেতশুভ্র হয়ে
আমার মন্থর বিবেকের মৃতদেব
তাপ জুড়িয়ে দেয়
এই মন্থরতায় টইটুম্বুর হয়ে
হাত তুললেই আমার জিত।"

ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ধারাও নানা স্তরে বিন্যস্ত হয়েছে আফ্রিকার কবিতায়। নাইজেরিয়ার খ্যাতনামা নাট্যকার-কবি ওল সয়েঙ্কা, ইফায়েনী মেনকিটি প্রমুখের কাজ এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেনকিটির কবিতা, 'Heart of the Matter'-এ আছে:

ঋ. "It is the vital deprivation
of the underdeveloped counties
That they do not have factories
for the manufacture of chewing gum
Nor grandstands for coca-cola
dispensation."

আফ্রিকার জনপ্রিয় লোকজ গানে ব্যঙ্গ ফোটে এভাবে:

এ. "সাদা মানুষ বলল
পরশু এসো
সাদা মানুষ বলল
দুপুরে এসো।"

আফ্রিকার কবিতার এই বহুমাত্রিক চারিত্র সেঙঘরের কাব্যেও লক্ষ্যযোগ্য।

চার

"Poetry must not perish. For then where would be the hope of the world ?"--Senghor.

কবিতার প্রতি গভীর ভালবাসায় নিমজ্জিত কবি লিওপোল্ড সেদার সেঙ্ঘর। এই ভালবাসা নিয়েই কবিতা লিখেছেন, কবিতা সম্পর্কে ভেবেছেন এবং কবিতার স্বপক্ষে কাজ করেছেন। আফ্রিকার কবিতা ও তার মৌল স্বভাবকে চিহ্নিত করে তার প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। রাষ্ট্রপতি ও প্রবীণ কবির পৃষ্ঠপোষকতা আজ হয়তো এক ধরনের বিশেষ মূল্য ও মর্যাদা বহন করছে কিন্তু কবিতা ও আফ্রিকাকে ভালবেসে এ কাজ তিনি শুরু করেছিলেন তরুণ বয়সে — ফরাসী দেশে প্রবাস জীবনে। ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত আফ্রিকার কবিতা সংকলন ও তার যোগ্য সম্পাদনা এই কালো অর্ফিয়ুসের এক অনন্য সাধারণ কীর্তি। ফরাসী আফ্রিকার কবিতায় আফ্রিকার সত্তানুসন্ধান, তীব্র সামাজিক চেতনা ও ফরাসী প্রকরণ বিশেষ করে সুররিয়ালিজমের এক নতুন সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। এই সুবাদেই সেজার প্রমুখ বামপন্থী কবি ফরাসী কবিকুলের কাছে বড় কবির মর্যাদা লাভ করেছিলেন। সেঙ্ঘরও সংবর্ধিত হয়েছিলেন শক্তিমান কবি হিসাবে। সেঙ্ঘর এ স্বীকৃতিকে স্বীকার করেও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আফ্রিকার কবিতাকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন ;—তাঁর ভাষ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আফ্রিকার স্বকীয় মেজাজ, এর সরল বলিষ্ঠতা ; এর তথাকথিত গহীন অন্ধকারময় সত্তার ভেতর থেকে তুলে আনলেন বজ্র ও বিদ্যুতের ছটা। অন্ধকার নাড়ীর-বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে তুললেন কোমল পুষ্পের উজ্জ্বল সম্ভার।

সেঙ্ঘরের আত্মবিশ্বাস ও প্রবল আফ্রিকান চেতনার সঙ্গত কারণ রয়েছে। আফ্রিকার প্রাচীন শিল্প ও সংস্কৃতি নিজের শক্তিতেই পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। পিকাসো থেকে শুরু করে অনেকেই তাঁদের কাজে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আফ্রিকার নাচের ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছিল জ্যাজে। সেঙ্ঘর এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কবি জলব যথাক্রমে আবিষ্কার করেছিলেন দিগ্বিজয়ী নিষ্ঠুর সম্রাট 'চাকা' ও 'তুতুলা'র কাহিনী। সেঙ্ঘরের কাব্য নাটিকা 'চাকার' সঙ্গে ম্যাকবেথ বা নিরোর কাহিনীর তুলনা করেছেন কেউ কেউ, অন্য-দিকে জলবের কোসা ভাষায় লেখা কবিতার সঙ্গে ট্রয়ের হেলেনের। আফ্রিকার

ঐতিহ্যগত (Traditional) শিল্প ও সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য (oral literature) বিষয় হিসাবে এলেও আধুনিক পাশ্চাত্যের নানা আঙ্গিক আফ্রিকার লেখকরা ব্যবহার করেছেন। সুররিয়ালিজম এর মধ্যে অন্যতম। আফ্রিকার কবিতায় সুররিয়ালিজমের ধারাকে সেঙ্ঘর অস্বীকার করেননি। তবে তাঁর বক্তব্য হল "African Surrealism is different from European Surrealism. European surrealism is Empirical. African Surrealism is mystical and metaphysical."

সেঙ্ঘর মনে করেন পাশ্চাত্য ও আফ্রিকার শিল্প-ভাবনায় ভিন্নতা রয়েছে। সেঙ্ঘর বলেছেন, পাশ্চাত্যে শিল্প হল প্রকৃতির অনুকৃতি (Imitation of Nature) অন্যদিকে আফ্রিকার শিল্পভাবনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন: In Africa, it is an explanation and understanding of the world, a sensitive participation in the reality which underlies the world, that is, in a surreality, or rather, in the vital forces which animate the world." আফ্রিকার কাব্য-ভাবনা সম্পর্কে তিনি বলছেন: "If a particular poem is effective it is because it awakes an echo is the mind and sensiblity of those who hear it. This is why the Fulani define a poem as 'speech pleasing to the heart and the ear."

সেঙ্ঘরের কাছে কবিতা আশা ও স্বপ্ন এবং শান্তি, মৈত্রী ও ঐক্যের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। কবিতার শক্তিতে বিশ্বাসী হয়েই তিনি এর আদিমতা, রহস্যময়তা ও অকৃত্রিমতার মৌল স্বভাবকে ক্ষুন্ন করার বিরোধী। তাঁর কাব্য-চিন্তার বিকাশকে এই বিশ্বাসের ভিতের ভেতরেই খুঁজতে হবে। তিনি বলেছেন:

"I still consider that the poem is only complete when it becomes song, speech and music at the same time. The so-called expressive diction which is now fashionable is anti-poem··· It is time to halt the process of disintegration in the modern world and first of all in poetry. Poetry must be restored to its origin, to the time when it was sung

and danced, as it was in Greece, in Israel, and specially in the Egypt of the Pharaohs, as it is to-day in Africa."

...The poem is like a Jazz score, where the execution is as important as the text. As I have published each of my collections, this idea has become stroger. And when at the head of a poem, I indicate the instruments to be used, this is not a mere form of words" (Modern African poets).

কবিতার আদিম সত্তায় এই প্রচণ্ড বিশ্বাসের জন্যই কোন কোন সমালোচক সেঙ্ঘরের কবিতাকে 'পেষ্টোরাল পোয়েট্রি' হিসাবে আখ্যাত করেছেন।

কবিতার এই আদিম প্রবণতার জন্যই বোধ হয় আফ্রিকার কবিতা ও গদ্যের মধ্যে পার্থক্য খুব দূরস্তর নয়—অন্ততঃ সেঙ্ঘর-এর ভাষ্য পড়ে তাই মনে হয়। সেঙ্ঘর বলছেন :

"In Africa, there is no fundamental difference between prose and poetry. Poetry is only prose with a more pronounced, more regular rhythm and in practice can be recognised because it is accompanied by a percussion instrument. The same sentence can be turned into a poem by accentuating the rhythm and so expressing the tension of being, the being of being."

গদ্য-পদ্যের এই ধরনের অবস্থানের একটা কারণ এই হতে পারে যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকার আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে বিকশিত হতে দেয়নি। শাসকের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা এমনকি বর্ণমালারও অস্তিত্ব ছিলনা পরাধীন আফ্রিকার বহু এলাকায়। সম্ভবতঃ সে কারণেই সমৃদ্ধ লোক-সাহিত্য অর্থাৎ মুখে মুখে প্রচলিত সাহিত্যই তার বিষয়-মাহাত্ম্য ও জীবন-সংলগ্নতার জন্য বেঁচেছিল। স্বাধীনতার নতুন পরিবেশে আফ্রিকার ভাষায় যে নতুন সাহিত্য গড়ে উঠেছে তাতে গদ্য-পদ্যের প্রভেদ দূরবর্তী হতে পারেনি। কবিতার ক্ষেত্রে অগ্রগামী সেনিগাল ও নাইজেরিয়ার কবিরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের পূর্ববর্তী শাসকদের ভাষায় অর্থাৎ ফরাসী ও ইংরেজীতে। বিদেশী ভাষায় কবিতা লিখলেও দেশের সোঁদা মাটি ও

আফ্রিকার কালো মানুষের ঘামের স্পর্শে সে কবিতা উজ্জ্বলভাবে আফ্রিকীয়। এটা অবশ্য কবিদের একটা বড় কৃতিত্ব।

আফ্রিকার স্বকীয় সৌন্দর্য, সিরিয়াসনেস, দেশের মানুষের প্রাণস্পন্দন ও খাঁটি কবিতা সেঙঘরের কাব্য-ভাবনার মূলকথা। যে কবিতায় এসব বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে তাকে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা জানিয়েছেন, পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সোমালী কবি জি, এফ, সৈয়দ-এর কবিতা সংকলনের ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

"His verses are like living flowers of the land of poesy, like sweet perfumed orchids. They are akin to the poems of Rabindranath Tagore. Syad does not amuse with his poetry, he is not an entertainer, he is a real poet, in love with poetry. In his verses he tells about the fate of his people."

পাঁচ

"মুক্তি সংগ্রাম হচ্ছে সব কিছু বলার আগে সংস্কৃতির কাজ বা সংগ্রাম।"
—এমিলকার কাব্রাল

গিনি-বিসাওয়ের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও সংস্কৃতি-তাত্ত্বিকের উপর্যুক্ত বক্তব্যের সঙ্গে মিল রয়েছে সেঙ্ঘরের চিন্তাধারার। দুজনের চিন্তার মৌল পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের চিন্তা-বিরোধাত্মক নয়। সেঙ্ঘর মনে করেন: আফ্রিকার রেঁনেশার পেছনে প্রধান ভূমিকা রাজনীতিবিদদের নয়—শিল্পী-সাহিত্যিকদের। তিনি এটাও বিশ্বাস করেন যে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসতে পারে না। তিনি বলেছেন আমেরিকার শ্বেতকায়রা নিগ্রোদের দাবী মেনে নিচ্ছেন এই কারণে যে আমেরিকার নিগ্রো-লেখক ও শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব সত্তা ও বৈশিষ্ট্য আপন আপন শিল্পকর্মে ভাস্বর করে তুলেছেন। সেঙ্ঘর তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন :

"If Europe has now begun to reckon with Africa, it is because African traditional sculpture, music, dancing, literature and Philosophy have compelled recognition from an

astonished world." ("No Political liberation without cultural liberation", 1956).

অন্য এক' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: "In art we have no lessons to learn from Europe. we are here on our own ground. All the lessons from African art must be retained as Contemporary European art itself has retained them. For some years African students have had lot to say about 'social realism', forgetting that the best soviet writers...Mayakovsky, Essenine and Gorki have always rejected a blind and narrow realism which gets no further than the outer husk of realily" ("Towards a new African inspired humanism, 1959),

সেঙঘর সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার ওপর জোর দিতে গিয়ে আর একটি প্রবন্ধে বলেছেন: "Nature has arranged things well, wanting each people, each race, each continent to foster with a particular preference, particular virtues and for its originality to be in this" (Cultural Roots and the Modern African Artist). নিগ্রো শিল্পী সাহিত্যিকদের সাফল্য ও ব্যর্থতার উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "তাঁরা যখন আফ্রিকার সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন থাকেন এবং এ সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেন তখন তাঁরা আন্তর্জাতিক মানে পেঁাছেন কিন্তু যখনই তাঁরা আফ্রিকার ('Mother Africa') দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তখনই তাঁদের পতন শুরু হয়, তাঁদের সৃষ্টি কর্মে আর কোন উৎসাহ থাকে না বাইরের পৃথিবীর।"

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অন্যান্য দেশের মত আফ্রিকায়ও ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। এটা স্বাভাবিকও। কারণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জটিল, সূক্ষ্ম। এর রয়েছে নানা আবেগ ও মনস্তাত্ত্বিক দিক। এসব বিষয় জীবন্ত বলেই এর মীমাংসা সহজ নয়। বিষয় দুটি সম্পর্কে নিগ্রো–বুদ্ধিজীবিরা এক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন প্যারীসে, ১৯৫৬ সালে। এতে সেঙ্ঘর বলেছিলেন যে, নিগ্রো-শিল্পী আফ্রিকার সমৃদ্ধ অতীত থেকেই প্রেরণা লাভ করবে। কারণ প্রাচীন আফ্রিকার সংস্কৃতি শুধু অবসরের বিলাস ছিল

না, জড়িয়ে ছিল জন্ম, মৃত্যু, উৎসব ও উৎপাদনের সঙ্গে।" এ মতের বিরোধিতা করে রাইট বলেন: "আফ্রিকার ঐতিহ্য যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, আধুনিক যুগের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। অতীতে এ সংস্কৃতি শ্বেত-কায়দের আক্রমনের মুখে আত্মরক্ষা করতে পারেনি।" অন্যদিকে সেজার মন্তব্য করেন: "অতীত ও বর্তমানের সেরা অংশ বাছাই করে এক নতুন ও উন্নত সভ্যতা সৃষ্টি করতে হবে।"

সেঙ্ঘরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত উপর্যুক্ত বক্তব্য জাতীয়তাবাদের মধ্যবিন্দু থেকে বেরিয়ে এসেছে। এতে যে একটু রক্ষণশীলতার সুর বেজে উঠছে তাকে তিনি পরবর্তীকালে অনেকটা সংশোধন করে নিয়েছেন।

নিগ্রোতার ধারণাও সেঙ্ঘরের চেতনায় ধীরে ধীরে সঙ্কীর্ণতামুক্ত হয়ে পূর্ণতার রূপ নিয়েছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঘানার পার্লামেণ্টে এক ভাষণে তিনি বলেন: "with us, or in spite of us, the civilization of the universal is growing up before our eyes, thanks to scientific discovery, technical progress, the increase in international and inter-continental exchanges. It would be a pity if Africans were not there at the meeting place. For the civilization of the twentieth century cannot be universal except by being a dynamic synthesis of all the cultural values of all civilizations."

বিশ্বের সকল সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয় প্রয়াসী হলেও সেঙ্ঘর আফ্রিকান শিল্প-চেতনার মৌল প্রবণতাকে ক্ষুণ্ণ করার পক্ষপাতী নন। তিনি বলেছেন: "In Africa art for arts sake does not exist. All art is social.....The African assimilates beauty to goodness and specially to effectiveness." আফ্রিকান নন্দনতত্ত্বের সূত্র উপর্যুক্ত বক্তব্যে বিধৃত। ওই বক্তব্যে যাঁরা উপযোগিতামূলকতার প্রাধান্য দেখতে পান সেঙ্ঘর তাঁদের 'বিশুদ্ধ' নন্দনতত্ত্বে বিশ্বাসী নন।

ছয়

"Politics is an active humanism"—Senghor.

১৯৬০ সালে সেনিগাল স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রনায়ক সেঙ্ঘরকে রাষ্ট্র, সমাজ, জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতিসহ বহু বিষয়ে ভাবতে হয়েছে। একজন

জাতীয়তাবাদী চিন্তানায়ক হিসাবে তাঁর ভাবনার এলাকা বিশাল ও বৈচিত্র্য-ময়। এর বহু বিষয় নিয়ে তাঁর দেশে ও বিদেশে বিতর্ক আছে। একজন শক্তিমান রাজনৈতিক নেতা ও মতাদর্শের প্রবক্তা হিসাবে তাঁর মতামত নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক স্বাভাবিক। এতে তাঁর চিন্তার সজীবতার পরিচয় আছে। এ জন্যই তাঁর কিছু চিন্তার পরিচয় তুলে ধরছি।

সেঙঘর বলেছেন, 'আফ্রিকায় স্বায়ত্তশাসিত বা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠছে। কিন্তু কালো মানুষেরা তাদের সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতা নিয়ে কি করছেন এবং কি করবেন? কারণ সচেতনতা ছাড়া স্বাধীনতা পরাধীনতার চেয়েও খারাপ। আমরা আমাদের মহান সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন নই। পুঁজি-বাদী সভ্যতা ও তাঁর আনুষঙ্গিক সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের নিগড়ে আবদ্ধ থেকে আমরা আমাদের সচেতনতা হারিয়েছি।'

এ সমস্যা মোকাবিলা করার জন্যই তিনি স্বাধীনতা অর্জনের গর্ব ও তৃপ্তি নিয়ে বসে না থেকে আফ্রিকার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও বিশেষ সমাজ বাস্তবতার মধ্যেই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করার আহ্বান জানিয়েছেন। বিদেশী রাজনৈতিক পদ্ধতি ও সাংগঠনিক ধারণাকে হুবহু আমদানী করার তিনি তীব্র বিরোধী। তবে তিনি বলেন: "of course parliamentary democracy and Socialism have their virtues and so do trade unions, co-operatives, the police, compulsory secular education. The Problem is not to stop them at the customs post, but to analyse their forms and their spirit and then to see what should be retained and how this can be made to take root in the realities of Afiica."

সেঙঘরের রাজনীতি চিন্তার কিছু অংশ এরকম: 'Let us look at the future with a 'prospective view such as the Senegalese philosopher Gaston Berger, would have called for. The civilization which whether we like it or not, is growing up before our eyes will not be constructed entirely out of the values of Europe and certainly not out of the values of only one of the two blocks. It will not be Russian or American' (1960)

সেঙ্ঘর তাঁর রাষ্ট্রচিন্তাকে সাজিয়েছেন এ ভাবে: প্রথমে, 'স্বদেশ', পরে 'জাতি' ও শেষে 'রাষ্ট্র'। তাঁর দৃষ্টিতে: "The Homeland is the heritage handed down to us by our forefathers; land, blood, a language or at least a dialect, manners and Customs, a folklore and an art, a culture, in fact, rooted in one particular area and given expression by one race."

তিনি মনে করেন, 'জাতি' (Nation) হল সচেতন ইচ্ছার ফল। স্বদেশের বিভিন্ন গ্রুপ ও এর বৈচিত্র্যকে জাতি ঐক্যবদ্ধ করে। স্বদেশের আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে সংহত করার মধ্যেই জাতি-সত্তা বিকশিত হয়ে উঠে। হেগেলের বক্তব্য উদ্ধার করে তিনি বলেছেন, প্রকৃতি স্বদেশের উদ্ভবকে মূর্ত করে তোলে কিন্তু জাতি গড়ে উঠে জাতীয় ভাবধারা ও মর্মবাণীকে কেন্দ্র করে। তিনি বলেছেন জাতির মাধ্যমে আমরা স্বদেশের ভৌগলিক সীমাকে অতিক্রম করি।

অন্যদিকে সেঙ্ঘরের মতে 'রাষ্ট্রের' বৈশিষ্ট্য এরকম:

"The state is a deliberately willed construction, or rather reconstruction…

—To attain it's objcets, the State has to inspire all its members, as individuals into persons...into conscious wills into living souls. If the Nation is the Conscious will towards reconstruction, the State is the main tool...The State realizes the will of the Nation and assures its permanence."

সেঙ্ঘর বলেছেন, আফ্রো-আরব সমাজে কোন বিরোধী শ্রেণী নেই আছে সামাজিক গ্রুপ। তাই কোন শ্রেণী-সংগ্রামের প্রশ্ন উঠে না। এই গ্রুপগুলোই সামাজিক প্রাধান্যের জন্য সংগ্রাম করছে। আমরা যদি সচেতন না হই তা হলে এই সামাজিক গ্রুপগুলিই শক্তি সঞ্চয় করে বিরোধী শ্রেণীতে পরিণত হবে। তাই বুদ্ধিজীবী, সরকারী চাকুরে, পেশাজীবী ও অন্যান্যরা যাতে কৃষক, কারিগর, মেষপালক প্রভৃতিকে প্রতারণা ও শোষণ করতে না পারে সেদিকে রাষ্ট্রের নজর রাখতে হবে'। এ চিন্তা একজন মানবতাবাদী সংস্কারকের। তবে তিনি নেহৃদা মানবতাবাদী নন।

সেঙ্ঘর মূলত জাতীয়তাবাদী, কিন্তু শভনিষ্ট (chauvanist) নন। জাতীয় চেতনার প্রাধান্য বজায় রেখেও সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তা-ভাবনা—যা আফ্রিকার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তাকে গ্রহণ করতে তাঁর আপত্তি নেই। মার্কস-এঙ্গেলস-এর রচনাবলী তিনি গভীর শ্রদ্ধা, যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করেছেন, পর্যালোচনা করেছেন কিন্তু মার্কসবাদ বা কমুনিজম গ্রহণ করতে রাজী হননি। কারণ তিনি মনে করেন মার্কসবাদ আফ্রিকার পটভূমিকায় প্রাসঙ্গিক নয়। তবে তিনি পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতি কিন্তু সে সমাজতন্ত্র হবে আফ্রিকার বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। তাঁর এ চিন্তাধারাকেই তিনি 'সক্রিয় মানবতাবাদ' বলে চিহ্নিত করেছেন। 'সক্রিয় মানবতাবাদ' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একজন জাতীয়তাবাদী নেতা যখন সঙ্কীর্ণতামুক্ত হয়ে সক্রিয় মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন তাঁকে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী হিসাবেই আখ্যাত করা যায়। রাজনীতির মাধ্যমেই তিনি সক্রিয় মানবতাবাদ ও প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করার সাধনায় রত। তিনি মনে করেন: "We must in fact create on the soil of Africa a new man and a new humanism"

সারা বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্কীর্ণতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ও পথ-বাছাইয়ের দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রক্ষাপটে সেঙ্ঘরের উপর্যুক্ত বক্তব্য প্রকৃতই তাৎপর্যপূর্ণ ও দৃষ্টি আকর্ষণক্ষম।